# ঝড়ের দোলা

মূল্য ছয় আনা।

—ছেলে মেয়েদের পড়িবার বই—

# শিবনাথ

শ্রীসুনীতি দেবী প্রণীত।

মূল্য আট আনা।

সহজ ভাষায় মনোহর গল্পের মত করিয়া সাধু ও কবি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন চরিত লিখিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের বড় একখানি ছবি ছাড়া আরও ছয়খানি ছবি আছে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
ও
অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

---

Printed by R. K. Rana. at the Cherry Press Ltd.,
93/1-A, Bowbazar Street, Calcutta
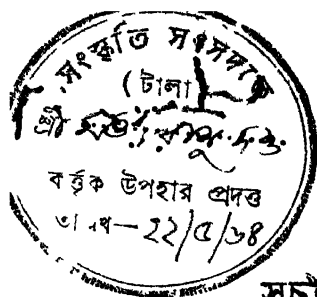
# সূচীপত্র।


| | |
|---|---|
| পাগল | শ্রীসুনীতি দেবী। |
| মাধুরী | শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ। |
| শ্রীপতি | শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। |
| জয়মালা | শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস। |


---

Published by Four Arts Club
88B, Hazra Road, Calcutta.
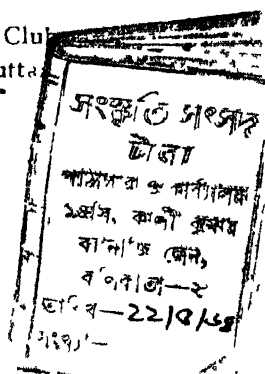
# উষার আলো।

—ছেলে মেয়েদের গল্পের বই—

— ছোটদের নিজের লেখা—

—বাঙ্গালাতে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ—

মূল্য আট আনা।

শীঘ্রই ছাপিয়া বাহির হইবে।

— — —

# ঝড়ের দোলা।

---

## পাগল।

দেখ ডাক্তার, কাল রাতে তুমি আমায় ভারি জব্দ করেছ। কি যে খাইয়ে দিয়ে গেলে, জান্‌তে পারিনি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি! ভেবেছিলাম রাতভোর গোলমাল করে আমার সঙ্গে আর সবাইকে জাগিয়ে রাখ্‌ব—তা আর হ'ল না। আজ আমায় কোন ওষুধ খাওয়াতে পারবে না।—খাব না—কি করবে? লোকগুলো সব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবে, আর আমি ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখ্‌ব—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করব?—সে হবে না। দেখনা আজ কি করি। আমার চীৎকার, আমার কান্না, সবাইকে শুন্‌তে হবে—সবাইকে আমার সঙ্গে ছট্‌ফট্‌ করতে হবে, তবে না মজা!

—আরে যাচ্ছ কোথা? বোস না একটু খানি—ঐ খানে, ঐ যে ঢের জায়গা রয়েছে।—আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দাও। এটা পাগলাগারদ নয় ত? নয়?—বাঁচলাম। আমি ভাবছিলাম আমায় হাঁসপাতালে না এনে পাগলাগারদে এনেছে বুঝি!—তবে এ গরাদ কেন? এরকম সব হাঁসপাতালে থাকে?

সত্যি ? আমায় ঠকাচ্ছ নাতো ? আমি পাগল নই বুঝতে পেরেছ ? সত্যি, আমায় বিশ্বাস কর, আমি পাগল নই। সব কথাই মনে আছে আমার। আমার অসুখ কেন হয়েছে জান ? খেটে খেটে নয়, ঐ ত তোমাদের ভুল।—ভেবে ভেবে হয়েছে।

—তোমার আরও কাজ আছে বলছ ? উঠতে হবে ? পাঁচমিনিট বোস না—তোমায় একটা কথা বলব। শুনতে হবে। কিন্তু আমার সামনে বসে অমন একশবারই ঘড়ির দিকে চেয়ো না। সময়ের মত জিনিষের হিসেব কি ঐটুকু একটা কলের মধ্যে ধরা পড়ে ?

—ডাক্তার, আমার এত অসুখ তবুও সে একবার আমায় একমুহূর্ত্তের জন্যও দেখতে এল না কেন ?—সে আসতে পারে না ? পথ নেই ? তুমি কি পাগল হলে নাকি ? এত বড় জগৎটায় পথ নেই ? সত্যি বলছি ডাক্তার তুমি আমায় অবাক করলে আজ ! একবারটি ঘরের বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখ দেখি,—দেখবে পৃথিবীময় কেবল পথ। সব পথই কি ঠিক আমার রুদ্ধ ঘরের কাছাকাছি এসেই ফুরিয়ে গেছে ? আমারই দরজায় পৌঁছতে পারে নি ? তা কখনও হতে পারে ?—ডাক্তার, তোমার বইয়ে পড়া ডাক্তারি বিদ্যেটা আজকের মত সেই বইগুলোর সঙ্গে আলমারিতে তুলে রাখ। আমায় ধরে রেখো না এমন করে। একবারটি তোমরা আমায় ছেড়ে দেবে ? আমি বাইরে গিয়ে দেখে আসব পথ আছে কি না ?—শুধু

একবার। দেবে না? কিন্তু কি লাভ হবে এতে তোমাদের, এমন করে আমায় সব হতে নির্ব্বাসিত করে রেখে?—

—ডাক্তার—ডাক্তার, ঐ দেখো, ওকে কারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?—কোথায় ওকে নিয়ে যাচ্ছে? ওরা কি আমারই মত ওকে ভালবাস্‌বে? ওকে সাম্‌নে ধরে, ওকে আশ্রয় করে, প্রাণের সকল চিন্তাকে মুঞ্জরিত করে তুল্‌বে? ডাক্‌বার আগে বুঝ্‌তে পার্‌বে তারা—সে ডাক্‌ছে? তারা বুঝ্‌বে ওর প্রাণের সব ব্যথা? বোঝার ভারে ক্লান্ত দেহটি যখন ওর মাটিতে ভেঙ্গে পড়্‌তে চাইবে, তখন কি কেউ ওর মাথাটি বুকে চেপে চুম্বনের প্রলেপ দিয়ে অনুপ্রাণিত করে তুল্‌বে ওকে?...

—নিয়ে গেল বুঝি? চোখে যে আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।—সব নিয়ে গেছে, আমার ব্যথা ত নিতে পারে নি। আমায় এক্‌লা ফেলে গেছে ভাব্‌ছে ওরা? আমি ত একলাটি নই,—আমার প্রাণের খাঁজে খাঁজে যে বেদনার যাতায়াত—ক্রন্দনের অবিরল কলরোল। আর তবে একলা কই? একলা কি থাক্‌বার জো আছে আমার?

—আচ্ছা ডাক্তার, বাইরে এত গোলমাল—আমি এত চেঁচাচ্ছি, কিন্তু লোকগুলো কি কিছুই শুন্‌তে পায় না? আমি কি পাগল? এটা কি পাগলাগারদ? তুমি আমায় মিথ্যে বল নি ত আগাগোড়া?—কেমন করে জানি? কে বলে দেবে আমায় ঠিক্ কথাটি?

—বেরুতে পারছি না। দেখেছ, আমায় তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে! আচ্ছা, সব ভেঙেই বেরিয়ে পড়্ব—যাব তার কাছে।

—কেন ওরা আমার সব ভার নেবার মানুষটিকে কেড়ে নিল? ওদের কিসের অভাব?—দেয়না ফিরিয়ে কাঁদাকাটি কর্লে—পায়ে ধরে চাইলে? আমার যে আর কিছুই নেই,—কিচ্ছু না।

—থাক্, কাজ নেই। সুখের মানুষ ওরা। দুঃখের ভাষা ওদের কাছে অবোধ্য—বিদেশীর ভাষা—পাগলের প্রলাপ! তাই আমাকে রেখেছে কয়েদ করে।—ওরা সবাই মুক্ত স্বাধীন।...

—ও কিসের শব্দ? বাজ পড়্ল? ঝড় উঠেছে বাইরে?—আঃ—একবার ছেড়ে দেয় না? একবার! ও আমার জীবন-মরণের সম্বল, আজ তোমায় পাই যদি তবে তোমায় বুকে নিয়ে এই ঝড়ের দোলায় দুলি...ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উধাও হয়ে ছুটি পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে...তোমাকে আমার নিবিড় বাহুবন্ধনে আঁক্ড়ে রেখে।...আস্বে তুমি? আস্বে? পাগলের ডাকে পাগল হয়ে সব ফেলে?...

এ কি! রক্ত?...পারিনি ভাঙতে লোহার গরাদ?...মাথা খুঁড়েই মরেছি?...

---

# মাধুরী।

সেদিনকার মজ্‌লিসে, বিনয় ডাক্তারের অদ্ভুত কথা শুনে সবাই যখন একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল—অর্থাৎ ?

বিনয় বল্‌ল—অর্থাৎ কূজন গুঞ্জন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে তোমাদের কবিরা যেটাকে ভালবাসা বলে প্রচার করতে চান, তার ওপর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

—কিন্তু এ ছাড়া ভালবাসাকে পাবার অন্য উপায় ত নেই।

—দরকার নেই আমার ভালবাসায়।

—তাহ'লে তুমি মানতেই চাওনা যে ভালবাসা বলে একটা কিছু আছে ?

—না, খুব মানি। কিন্তু তোমাদের মত করে নয়।

—বেশ, তাহ'লে বুঝিয়ে দাও তোমার ভালবাসাটা কি ধরণের।

—এর মধ্যে বোঝাবার বা বোঝ্‌বার কিছুই নেই। আমার মনে হয়, ভালবাসার বিশেষ কতকগুলি বাঁধা রাস্তা নেই। ওর বিশেষ কতকগুলি রূপও নেই, ওকে ধর্‌বারও কোন উপায় নেই। ও কতকটা হাওয়ার মত, আপনার খুসীতেই চলে ফেরে। ওর রং পিয়াল ফুলের রেণুর মত কি রক্ত জবার মত তা জানি না, তবে সব চেয়ে যার সঙ্গে ওর

বেশী সাদৃশ্য আছে তা হচ্ছে—চোখের জল। টাট্‌কা বেলায় একটু আভাষ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পুরাণ হলে নয়। যেটা থাকে, তা হচ্ছে—ব্যথা। ব্যথার ব্যাখ্যা করতে পার ?

— তুমিই কর।

—আমিও পারি না। কিন্তু একজন একবার চেষ্টা করেছিল, তার কথাই বলবার জন্যে আজ তোমাদের ডেকেছি।

গল্পের নাম শুনে আমরা সবাই খুশী হয়ে উঠ্‌লাম। কেননা সময় কাটাবার এমন অস্ত্র আর দুটো নেই। তা ছাড়া গল্পটা ভাল হ'লে ভালই, না হ'লেও বেশ হয়, আশ্‌ মিটিয়ে দুচার কথা বক্তাকে শোনান চলে। আমরা সবাই বিনয়ের চার পাশে জমাট্‌ হয়ে বস্‌লাম, বিনয় বল্‌তে আরম্ভ করল :—

—মেডিক্যাল্‌ কলেজের কাজ ছাড়্‌বার ঠিক তিন মাস পূর্ব্বে, একদিন সন্ধ্যাবেলা যে রোগীটি আমার ওয়ার্ডের তের নম্বর ক্যাবিনে এসে উঠ্‌ল, তার নাম ছিল নিশীথ। কিন্তু তার রোগের নামটা তোমাদের কাছে বলে লাভ নেই কেন না বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

সার্জন সাহেব তার বুকে ছুরি বসালেন। ছুরি বসানটা খুবই আশ্চর্য্য রকমের হয়েছিল। কাগজে কাগজে তার বিবরণ সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু রোগীর জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না।

নিশীথ আমার তত্ত্বাবধানে একমাস বাইশ দিন ছিল।

তার অসুখের সময় যে দুটি মানুষ প্রতিদিন তাকে দেখ্‌তে আস্‌ত, তাদের পরিচয় আমার পেশেণ্টের এই ডায়েরী হ'তেই পাবে। আমার আর বিশেষ কিছুই বল্‌বার নেই। ভূমিকা আমার শেষ হয়েছে—এখন আরম্ভ করা যাক্ ঃ—

১২ই অক্টোবর।

সহরের প্রায় সমস্ত ডাক্তারই আমায় পরীক্ষা করে গেল, কিন্তু কারো কাছেই আমি পাশ হতে আর পার্‌লাম না। হবার আশাও নেই, আমায় মর্‌তে হবে।

— অবশ্য এ কথাটা খুব আশ্চর্য্যের নয়, সবাইকেই একদিন মর্‌তে হবে তা জানি, তবুও ঐ কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভিতর যে কি করে ওঠে তা কেউ বুঝ্‌বে না। মানুষত দূরের কথা, গাছপালা হ'তে আরম্ভ করে বাড়ীর কুকুরটার প্রতিও হিংসায় আমার মন ভরে যায়—ওদের মর্‌তে হবে না—অন্ততঃ তার খবর এখনও ওদের কাছে এসে পৌঁছায় নি।

—সবাই ওষুধের গ্লাসটা আমার মুখের কাছে তুলে ধরে বলে—'এটা খাও, তাহলেই ব্যাথাটা কম্‌বে। এর উত্তর আপনা হতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—ছাই কম্‌বে। একেবারে কম্‌বে আমি ম'লে।

—কিন্তু বাঁচ্‌বার জন্যে যতখানি ইচ্ছে আমার বুকে আছে,

ঠিক ততখানি শতকরা নব্বই জন সুস্থ মানুষের নেই। সেদিন নির্লজ্জের মত ডাক্তারের হাত চেপে ধরে বল্‌লাম —আমায় বাঁচিয়ে দিন!

তিনি হেসে বল্‌লেন—কিছু ভাব্‌বেন না, ভাল হবেন। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি হ'তে বুঝে নিলাম, তিনি বল্‌তে চান—তাঁর কাছে আমি যেন একটা অত্যন্ত অন্যায় আব্দার করেছি। বাঁচ্‌তে চাওয়ার ওপর আমার যেন কোনই অধিকার নেই! কিন্তু কি করে ওঁকে আমি বুঝিয়ে বল্‌ব, বাঁচ্‌তে চাওয়ার ওপর আমারই সব চেয়ে বেশী অধিকার, কেন না—আমার যে সবই আছে—কিছুরই ত অভাব নেই।

—মরুক্ না ঐ পথের ভিখারীটা, ওর হাড়ে বাতাস লাগ্‌বে। মরুক্ না ঐ যুবা, যে জীবনের সব চেয়ে বড় ব্যর্থতার বোঝা মাথায় চাপিয়ে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবীর বুক ভরিয়ে তুল্‌ছে। মরুক্ না ঐ বৃদ্ধ যে সব পেয়ে সব হারিয়ে মরণ-মরণ করে ডাক্‌ছে।--আমি কেন মর্‌ব?—কেন—কেন? আমার যে সবই আছে—ঘরভরা বুকভরা। এ সমস্ত ফেলে—মাগো, বুকের পাঁজরের তলায় আবার সেই ব্যথা…

*　　*　　*

২৪শে অক্টোবর।

যত দিন বাড়ী ছেড়ে হস্পিটালে এসেছি,তার মধ্যে শুন্‌লাম দিন চার একরকম মড়ার মতই ছিলাম। অনেক তর্কের পর নার্সের কাছ থেকে আজ আমার খাতাটা আদায় করে নিয়েছি। আমার মাথার দিকের বিছানাটাকে অল্প একটু উঁচু করে দিয়েছে। আমি বুকের ওপর খাতাটাকে রেখে লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌তেই নার্স আমার কপালের ওপর হাত রেখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল! আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে পড়েছিলাম। তাকে জিগ্‌গেস কর্‌লাম—কি চাও? সে বল্‌লে—কিছু না, শুধু দেখ্‌ছিলাম তোমার জ্বর আছে কিনা।—ওর হাতের স্পর্শ বড় মিষ্টি। ওর দৃষ্টি বড় করুণ।

—বাড়ী থেকে যখন আসি তখন বড় ইচ্ছে করেছিল একবার মাধুরীকে দেখ্‌তে; কিন্তু সে আসেনি। চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছে অপারেশন শেষ হয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমার মুখের দিকে তাকাবার তার সাহস নেই।…

সে তার নিজের দিক থেকে দেখে যেটি ভাল বুঝেছে তাই করেছে, কিন্তু এই অপারেশন শেষ হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার জীবনও শেষ হ'ত, তাহ'লে কি অশান্তি বুকে নিয়ে মর্‌তাম তা' কি ভেবেছিল সে? কি স্বার্থপর মেয়েরা!

—নার্স বল্‌ল—সেদিন বিকালে আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন মাধুরী এসে আমার পায়ের কাছে বসে শুধু আমার

মুখের দিকে তাকিয়েছিল! তারপর যখন বাইরের লোকদের চলে যাবার ঘণ্টা পড়্‌ল, সে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন রইল সে আমার মুখের দিকে চেয়ে, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর ফেল্‌বার জন্যে আমার যা কিছু সবই যখন তার পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিতাম, তখন ত তাকায় নি সে?—না-না, তাকিয়েছে বৈকি। কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। সেইটুকুকেই যথেষ্ট বলে মন বোঝাতে পারিনি।

—আমার বুকের ভিতর যতখানি ঠাঁই তার জন্যে রেখে-ছিলাম, সে সবটুকুই যে শূন্য পড়ে ছিল! স্বেচ্ছায় এসে সেই ঠাঁই সে পূর্ণ করুক,—এই ছিল আমার কামনা, কিন্তু আমি তাকে ডাক্‌ব না,—এই ছিল আমার গর্ব্ব। এই গর্ব্ব আমার কামনাকে পাহারা দিত। কোন মতে তাকে তার সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেয় নি।

কিন্তু সে সব কথা নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া না করাই ভাল, কারণ কথা দিয়ে ত প্রকাশ কর্‌বার জিনিস এ নয়। আমার বুকখানাকে চিরে ফেল্‌লেও ত সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে না। সব অসম্পূর্ণই থেকে যাবে! কিন্তু কিছু না করেও যে আর বাঁচি না! কিছু বল্‌বার নেই তবু বল্‌তে হবে। শুধু যা আমারই একলার জিনিস, তাকে ভাগ করে দেবার ইচ্ছেটা যে এখানে পাগ্‌লামী। তবু ওটা না করে পারি না! আমার এই ছেলে-

মানুষী দেখে হয়ত সবাই হাস্‌বে। হাস্‌বারই ত কথা। আমি তাকে দেখি আমার চোখ দিয়ে। আমার চোখ ত তাদের নয়।

—সময় সময় মনে হয় এ আর সইতে পারি না। সকলের মত আমিও হার মেনে বলে ফেলি—ভালবাসি।

—ও কথাটা অনেকবার আমি নিজের মনে বলেছিও, কিন্তু তাকে বলি নি—বল্‌তে সাহস হয়নি।

—ওটা যেন একটা মস্ত বড় মিথ্যে কথা। আমি তাকে চাই, তাকে পেলে আমি বেঁচে যাব,—এগুলো ত সবই আমার একলার স্বার্থ দিয়ে জড়ান। আমারই সুখ শান্তির জন্যে তাকে পেতে চাই। আমার এই একটানা বৈচিত্র্যহীন জীবনটাকে তার হাত দিয়ে সুন্দর করে পূর্ণ ক'রে নেব, তাই ভালবাসি-কথাটার যাদু দিয়ে তাকে ভুলিয়ে আমার দিকে টেনে আন্‌তে চাই—এত আয়োজন করি। শুধু স্বার্থ আর স্বার্থ। কোন অভাব আমার রাখ্‌ব না, এই আমার ইচ্ছা। তাছাড়া আমার জীবনের দু-একটা দিন দিয়ে যা জান্‌লাম, শুধু তারই ওপর বিশ্বাস রেখে 'ভালবাসি' বল্‌বার অধিকার আমার নেই, কেননা সমস্ত জীবন দিয়ে ত জানি নি।—কিন্তু জানতেও বুঝি আর পার্‌লাম না! তবু...

—পাঁচটার ঘণ্টা পড়্‌ল! নার্স আমার হাত থেকে খাতাটা কেড়ে নিতে চাইছে, থাম্‌তে হ'ল। কিন্তু এবার সে আস্‌বে।...

—বারান্দায় অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!

ওরই মধ্যে কখন তার পায়ের শব্দটিও বেজে উঠ্‌বে? কখন শুন্‌তে পাব? আমার যে আর দেরি সইছে না…

২০শে অক্টোবর।

এখানে এসে পর্য্যন্ত আমার যেটির ওপর সব চেয়ে বেশী ভয় ছিল তা হ'য়ে গেছে। ভাল হয়েছে কি?—না হয়নি। এটা যদি না হত, মানুষের বুকে যতখানি কৃতজ্ঞতা থাকতে পারে তা ভগবানের চরণে ঢেলে দিতাম।

—এখানে এসে পর্য্যন্ত রাতদিন প্রার্থনা করেছি—প্রভাতের সঙ্গে মাধুরীর যেন না দেখা হয়। এই দেখা না হওয়ার জন্যে কত যে ছেলেমানুষী উপায় বার করেছিলাম তা সুস্থ অবস্থায় শুন্‌লেও হয়ত হাসি পে'ত।

—প্রভাতকে বলেছিলাম—দেখ্‌ ভাই, চারটের পর হতে কেমন যে একটা ঘুমের মত আস্‌তে থাকে, কিছুই আর ভাল লাগে না। তুই এক কাজ করিস্‌, ছটার সময় আসিস্‌। জানিস্‌ ত ডাক্তার বলেছে ঘুমটা আমার ভারি দরকার। কিন্তু তুই কাছে থাক্‌লে ত আর তা হবার যো নেই, বকর্‌ বকর্‌ কর্‌তেই কেটে যাবে।

—মাধুরীকেও ঠিক ঐ কথাই বলেছিলাম, কিন্তু তাকে আস্‌তে বলেছিলাম একঘণ্টা পূর্ব্বে। আর ছটা বাজ্‌তে পনের মিনিটের সময় একরকম জোর ক'রেই তাকে ঘর হ'তে বার

ক'রে দিতাম। মনে হ'ত ও যদি আর না আসে তা হ'লে ভাল হয়।

—কি ভয়ানক আমার মনের অবস্থা যে হ'ত তা বোঝাতে পার্‌ব না।

—সে বল্‌ত—আর একটুখানি থাকি নিশীথ···

—আমার মুখের ওপর তখন এমন একটা ভাব ফুটে উঠ্‌ত, যা দেখে সে আর কথা বল্‌তে সাহস পেত না—চলে যেত। আমার বুকখানা যে কত শক্ত তা বুঝ্‌তে পার্‌তাম যখন মাধুরী বল্‌ত—আর একটু থাকি নিশীথ···

—আমি কাপুরুষ। একথা নিজের হাতেই আমি লিখে যাচ্ছি, এতে আমার লজ্জা নেই। কারণ কা'রো মন ভুলিয়ে শ্রদ্ধা অর্জ্জন কর্‌বার ইচ্ছে আমার নেই। তা ছাড়া এই লেখা আমার কা'রো কাছে নালিস নয়। কা'রো সহানুভূতিরও আমি প্রত্যাশী নই, কা'রো বিচারও আমি সহ্য কর্‌ব না।

—আমি কাপুরুষ। আমার মন অত্যন্ত ছোট এবং সন্দিগ্ধ। আমি সবার হ'তে কত নীচে তা বুঝ্‌তে পারি যখন প্রভাত আর মাধুরীর প্রতি আমার এই ব্যবহারটার কথা ভাবি। আমার সমস্ত ভালবাসা ঈর্ষ্যার কালিতে ভ'রে যায়; দিনের মধ্যে অত্যন্ত ছোট ঐ একটি ঘণ্টার দাবী করতে গিয়ে।

—মাধুরী যখন আমার কাছে থাকে তখন দেখি নার্স ও ঘন ঘন আমার টেম্পারেচার দেখে যায়!—কেন, কেন আসে ওরা?

—মাধুরী যতক্ষণ আমার কাছে থাকে ততক্ষণ শুধু আমার মনটাকে সংযত করতেই কেটে যায়। তার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক্ তার দিকে ভাল ক'রে তাকানও হয় না। কিন্তু আমার মন থাকে সম্পূর্ণ সজাগ সামনের ঐ ঘড়িটার প্রতি !...

—মাধুরীও এখন প্রতিবাদ করা ছেড়ে দিয়েছে। আমার দৃষ্টির অনুসরণ করে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকায়,তারপর আমার কথা শোন্‌বামাত্র উঠে দাঁড়ায়। আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। তার চোখের দিকে চাইতে সাহস হয় না—কি জানি সে যদি বলে ফেলে—যাব না...

—কপালের ওপর একটা স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে দেখি প্রভাত !

ওকে দেখে এক নিমিষে আমার মন কি ভয়ানক কঠিন হয়ে উঠ্‌ল ! সেই মুহূর্তেই যদি মরে যেতে পার্‌তাম ..

—প্রভাত বল্‌ল – বড় কি কষ্ট হ'চ্ছে নিশীথ ?

—আমি বল্‌লাম—হাঁ ভাই, বুক যেন ফেটে যাচ্ছে।

—সে বল্‌ল—তোমাকে ভাল করবার ক্ষমতা যদি আমার থাক্‌ত নিশীথ...

—গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে যখন ওর কথা শুনি ! কি পবিত্রতা মাখান ওর মুখের ভাষা ! তবু ঘৃণা ছাড়া আর কোন ভাব ওর প্রতি আমার মনে নেই।—ওকে ঘৃণা করি ও অত সুন্দর

বলে। ওকে অসহ্য লাগে ওর কথা অত মিষ্টি বলে—ও আমার শত্রু...

২৮শে অক্টোবর।

এই মাত্র সাতটার ঘণ্টা পড়্‌ল—ওরা চলে গেছে। আজ প্রভাত এসেছিল প্রতিদিনের চেয়ে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, আর মাধুরী এসেছিল পাঁচ কোয়ার্টার পরে।

—আমি আজ ভালই আছি। মনের মধ্যে যে ফোড়াটা মুখ উঁচু করে উঠ্‌ছিল, তার উপর অদৃশ্য চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত হয়ে গেছে। ব্যথা এখন ক্লান্তি হয়ে সর্ব্ব দেহে ছড়িয়ে পড়েছে।

—আজ প্রথমেই প্রভাত আমায় বল্‌ল—উনি কে নিশীথ? ঐ যে কাল এসেছিলেন?

—আমি বল্‌লাম—ও মাধুরী।

—এই কথাটি এমন ভাবে বল্‌লাম, যাতে মাধুরীর ওপর আমার যে একটা বিশেষ অধিকার আছে, এ পৃথিবীতে একা আমিই যে ওর সবচেয়ে কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছি, আর কারো সেখানে যাবার অধিকার নেই. এই ভাবটি বেশ জাগ্রত ছিল। বলেও বেশ তৃপ্তি পেলাম।

—প্রভাত বল্‌ল,—ওঃ! কৈ, আমিত জান্‌তাম না! আমায় ত বলনি ওঁর কথা একদিনও?

—সেও এমনভাবে এই কথাগুলি বল্‌ল যেন মাধুরীর সম্বন্ধে

কোন কথা তাকে না বলে বড় অন্যায় করেছি! তাকে যেন এতদিন একটা মস্তবড় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখে ছিলাম!

—প্রভাত আমায় আর কোন প্রশ্ন করে নি। কিন্তু সে আমার বিছানার চাদরটা নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ছিল। যেন চাদর পাতার মধ্যে অনেক ভুল রয়ে গেছে, তাই সেটা শোধ্‌রাবার জন্যে তু'হাত দিয়ে টানাটানি করছে। এইভাবে অনেকক্ষণ কাট্‌ল। তার পর শুন্‌লাম তার পায়ের শব্দ!... বুকের ভিতর আনন্দের বাজ্‌না বেজে উঠ্‌ল। কিন্তু সে বাজ্‌না ভাঙ্গা যন্ত্রের আওয়াজের মত বেসুরো—এলো মেলো···

—প্রভাত তাড়াতাড়ি উঠে চেয়ারটা তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার বিছানায় এসে বস্‌ল। তার এই ভদ্রতার ত কোন দরকার ছিল না। মাধুরী যদি আমার বিছানায় বস্‌ত তাতে কি ক্ষতি হত?

—আজ আর একটি জিনিসও হারালাম। আমি ভাল হয়ে উঠ্‌ব কিনা জানি না। যদি না উঠি তা হলে এই কথাটি বুকে নিয়ে মর্‌ব যে ২৮শে অক্টোবর মাধুরী আমার কপালের উপর হাত রাখে নি—যদি ভাল হয়ে উঠি তা হলেও ঐ একটি দিনের, অবহেলা আমার সমস্ত জীবনের সুখকে ম্লান করে রাখ্‌বে।

—অভিমান বুকভরা থাক্‌লেও প্রায় কাঙ্গালের মতই বলে ফেল্‌লাম—মাধুরী আমায় একটু খাবার জল দাও না।

—মাধুরী ওঠ্‌বার পূর্ব্বেই প্রভাত আমায় জল এনে দিল।—ও আমার কত বড় শত্রু…তবু সেই জল আমায় খেতে হ'ল!—সে কি শাস্তি…

সাতটার ঘণ্টা পড়্‌তেই ওরা উঠে দাঁড়াল। আমি বল্‌লাম—প্রভাত, তুমি এক কাজ কর না ভাই, মাধুরীকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এস। অন্ধকার হয়ে গেছে, একা যাওয়াটা ঠিক হবে না।

—মাধুরী বল্‌ল—কাল তোমাকে একেবারে সুস্থ দেখ্‌তে চাই।

—আমি বল্‌লাম—দেখ্‌বে। তার হাতের আঙ্গুলগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোন বাসনা আমার মনে ছিল কি?

—আজও বারান্দা হ'তে ওর পায়ের শব্দ এল, কিন্তু একা নয়, আর এক জনের সঙ্গে মিশে! আমার কি আর চেন্‌বার শক্তি আছে? কোনটি তার পায়ের শব্দ?

২৯শে অক্টোবর।

—আজ নার্স কিছুতেই আমাকে খাতাটা দিতে চাইছিল না। সে বল্‌ল—তুমি কল্পনায় এমন সব আজ্‌গুবি ছবি আঁক যাতে শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয়।

—তাকে কথায় বুঝোতে না পেরে আমার শেষ অস্ত্রটি ব্যবহার কর্‌লাম। বল্‌লাম—ভালবাসার ওপর তোমার শ্রদ্ধা আছে কি?

—সে চম্‌কে উঠ্‌ল। বল্‌ল—কেন ওকথা জিগ্‌গেস কর্‌ছ ?

আমি বল্‌লাম—য'দ থাকে তাহলে খাতাটা আমায় দাও। সে আব কোন প্রতিবাদ না করে, খাতাটা আমার বিছানাব ওপর রেখে ঘব হতে বেবিযে গেল।

—আজ প্রভাত আব মাধুরী এক সঙ্গেই এসেছিল। মনে হ'ল তারা এক সঙ্গেহ বাড়ী থেকে বেবিয়েছে। এদেব মধ্যে সঙ্কোচের বাঁধনটা ছিঁড়ে গেছে। প্রভাত যেন মাধুরীব ছেলে-বেলাকার খেলার সাথীটি !

—আমি প্রভাতকে বল্‌লাম—ভাই, আমাকে একখানা ব্রাউনিং কিনে এনে দাও না।

—প্রভাত বল্‌ল—কাল নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।

—আমি বল্‌লাম—না না আজই এনে দাও। রাতে যতক্ষণ না ঘুম আসে বড় ছট্‌ফট্‌ করি, ঐ সময়টাতে পড়্‌ব।

—প্রভাত দোমনা হ'য়ে উঠ্‌ছিল। আমার ঘর ছেড়ে যেতে অর্থাৎ মাধুরীকে ছেড়ে যেতে তার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। এইটে আমি ভাল করেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম তাই আমিও আব কাল পর্য্যন্ত সবুর কর্‌তে চাইলাম না।

মাধুরী বল্‌ল—যান্‌ না প্রভাত বাবু, এখান থেকে ত আর বেশী দূর নয়।

—প্রভাত ভারি খুসী হয়ে উঠ্‌ল এবার। বল্‌ল—এখুনি

যাচ্ছি। সে যেন মাধুরীর ফরমাস খাটতেই গেল, আমার বই আনতে নয়।

—প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, প্রভাত আমাদের কাছে নেই ; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমরা কারো সঙ্গে কোন কথা বলি নি। যেন আমরা পরস্পরকে চিনিও না। কি কষ্টে এই পাঁচ মিনিট আমার কেটেছে তা আমিই জানি। হঠাৎ এক সময় মাধুরী বলে উঠ্ল—আচ্ছা, প্রভাত বাবু তোমার কে হন ?

—বাঁচ্লাম। বল্লাম—ও আমার ভাই ; আপনার না, সেজপিসীর ছেলে।

—মাধুরী বল্ল—কিন্তু ওঁর কথা একদিনও ত আমায় বল নি ?

—আবার সেই অভিমানের সুর ! বল্লাম—মনে ভেবে ছিলাম একেবারেই পরিচয় করিয়ে দেব, তা আর হ'ল না মাধুরী।

—স্পষ্ট দেখ্লাম তার সমস্ত মুখখানি রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্ল। আমি বল্লাম—প্রভাত যখন আমার মার কাছে আসে, তখন তার বয়স ছিল দু বছর। আমি ছিলাম ওর চেয়ে ছ'মাসের বড়। আমার বয়স যখন হ'ল কুড়ি, মা মারা গেলেন আমার হাতে সমস্ত সম্পত্তি আর প্রভাতের ভার দিয়ে। ও সবারই আদরের মানুষ। ভগবান ওকে কোনগুণেই বঞ্চিত করেন নি।

—আমি চুপ কর্‌তেই মাধুরী আমার মুখ হ'তে চোখ তুলে নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আমি বল্‌লাম—যে ওকে একবার দেখে, ওর কথা একবার শোনে সেই ওকে ভালবাসে।

—আমার কথা শুনে মাধুরী অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, উঠে গিয়ে ইলেক্‌ট্রিকফ্যানের রেগুলেটারটা ঘুরিয়ে দিল, তারপর সে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাক্‌ল—নিশীথ!

—জীবনে এই প্রথম আমি মাধুরীর ওপর রাগ কর্‌লাম! ওর এই ডাকার মধ্যে ভালবাসা ছিল না, কিন্তু একটা আবেগ ছিল। সে আবেগও আমার প্রতি করুণায় নয়। তার মন যে প্রভাতের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, কিছুতেই তাকে আর ধরে রাখ্‌তে পার্‌ছে না, এই কথাটি স্মরণ করে সে নিজের কাছেই যেন লজ্জিত হচ্ছিল।

—মাধুরীর অবস্থাটা যেন সেই পথিকের মত যে পথের মাঝখানে এসে বুঝ্‌তে পারে—সে ভুল পথে এসেছে। তার এই নিশীথ ডাকটা সেই ভ্রান্ত পথিকের হতাশা এবং ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাসের মতই। সে আর এগিয়ে যেতে চায় না।

—কিন্তু সকাল বেলা পথের বুকে পথিকের পা দুটি যে সুরে উঠ্‌ছিল পড়্‌ছিল, এখন ত আর তেমন হল না! তার চলা কলের মানুষের মত হয়ে গেল কারণ তার প্রাণ তাকে আর চালাচ্ছে না। ফেরো পথিক—ফেরো। চলা তোমার অসমাপ্তই

থাক্ ক্ষতি নেই, কিন্তু অনিচ্ছার চলা দিয়ে পথের বুকে আর ব্যথা দিওনা। যেটুকু ওকে বুঝে এসেছিলে, সেইটুকুই ওর যথেষ্ট।

—আমি মাধুরীকে বল্‌লাম—আমি তোমাদের বড় ভাবিয়ে তুলেছি না মাধুরী? বড় কষ্ট দিচ্ছি?

—সে বল্‌ল—আমি আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমার সেবা করতে পারি,—

—আমি বল্‌লাম—অর্থাৎ আমি আমার সমস্তটা জীবন এই হস্পিটালে কাটাই আর তুমি আমার সেবা কর।—কিন্তু জান না কি, সেবায় ক্লান্তি আসে, সেবা গ্রহণেও প্রবৃত্তি চলে যায়?

—মাধুরী আমার বুকের ব্যাণ্ডেজ্‌টার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বল্‌ল—নিশীথ তুমি আমার সব চেয়ে আপনার!

—যাক্, তাহ'লে সব বেশ পরিস্কার হ'য়ে গেল। ঠিক ঐ কথাটা পূর্ব্বেও অনেকবার ও আমায় বলেছে, কিন্তু তখন বুঝ্‌তে পারিনি! ঐ 'আপনার' কথাটা আছে কর্ত্তব্যের রশিতে বাঁধা, কেন না আমি ওর বাপ্‌কে একটা মস্ত বিপদ থেকে বাঁচাই। 'আপনার' কথাটার অর্থ আজ যেমন করে বুঝ্‌লাম এমন আর কোন দিন পারিনি। আমার ভালবাসা আমায় অন্ধ করে রেখেছিল। আমার ভালবাসায় কোন 'কর্ত্তব্য' ছিল না, সে ছিল আমার কাছে অত্যন্ত 'সহজ', যেমন আমার নিশ্বাস—কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝেছ মাধুরী, আমি তোমার

জন্যে যা-কিছু করেছি. যা-কিছু দিয়েছি, তুমি ভেবেছ, আমার যে আছে. তাই দেখাবার জন্যেই দিই। তাই সেগুলোকে আর-সকলের দেওয়া জিনিসের মত করে দেখ্‌তে না। ধনীর দান বলে যত্ন করে বাক্সে বন্ধ করে রাখ্‌তে। হায় মাধুরী এটা বোঝনি. আমার যে আছে. ভগবান যে আমায় দিয়েছেন. তাঁর সেই দানকে সার্থক কর্‌তাম তোমাকে হীরের ফুল কিম্বা জরীর কাপড় দিয়ে। ওদের ঠাঁই. ভিখারীর উপহার, গাছের ফুল বা সাধারণ কাপড় হতে একতিল নীচে নয়। তবু কেন যে আমার পূজা ঠাঁই পেল না -সব আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। আমার ভালবাসাকে ধনীর খেয়াল বলে জানলে! মাধুরী. তোমার প্রতি আমার এ অভিমান অনন্তকাল থাক্‌বে।

—আমি মাধুরীকে বল্‌লাম—প্রভাত যে কেন এত দেরী কর্‌ছে তা বুঝ্‌তে পারছি না। জান মাধুরী ও বলে. আমি ওর সবচেয়ে আপনার। তোমাদের দুজনের এ দুটি কথা আমার মনে থাক্‌বে।

—ভারি সুন্দর মানুষ ঐ প্রভাত! ওকে যত জানবে তত তোমার ভাল লাগ্‌বে। আমরা এক মায়ের ছেলে নই যদিও কিন্তু এক মায়ের হাতে মানুষ।

—এই সময় প্রভাত ঘরে ঢুক্‌ল। তার হাতে সেই বইখানি।

—আমি বল্‌লাম—বাঁচালে ভাই। কিন্তু আর একটি কাজ করতে হবে। মাধুরী, তুমি ওকে সেই কবিতাটা পড়্‌তে

বলনা—If God compel thee to this destiny to die alone with none beside thy bed…তার পর কি ? আমার সব মনে নেই। পড়'না প্রভাত, আমার খুব ভাল লাগ্‌বে। কিন্তু মাধুরী তাকে অনুরোধ করল না—প্রভাতও পড়্‌ল না।

মাধুরীর কাছে আমি যখন প্রভাতের প্রশংসা কর্‌ছিলাম, তখন সে কি বুঝ্‌তে পেরেছিল ওরই আড়ালে কি লুকিয়ে রেখেছিলাম ?—আর পারলেই বা কি আসে যায় ?—কিছু না। কোন ক্ষতি নেই।

—আমি ওকে আজীবন হিংসা করে এসেছি, ও সব বিষয়েই আমায় এগিয়ে যে'ত বলে। তাই মাধুরীকে যখন পেলাম, সে কথা ওকে জানাই নি। কি জানি এখানেও যদি ও আমার আগে গিয়ে দাঁড়ায়।

—পৃথিবীর সব জায়গার দাবী আমি ছাড়্‌তে পারি শুধু মাধুরীর পাশে দুটি পা রাখ্‌বার জায়গা ছাড়া।—মরণ যদি আমার এ অধিকার কেড়ে নিত দুঃখ ছিল না। কিন্তু এখানেও যে ঐ দস্যুর কাছে আমার হার হ'ল এই ব্যথা যে ভুল্‌তে পার্‌ছি না…

—প্রভাত আর মাধুরী আমার বিছানার দুপাশে বসে ছিল। তারা যে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল, ঐ তাকানর ভিতর যে কত গোপন দুঃখ আনন্দের প্রস্রবন লুকান ছিল তা আমি জানি।

—আশ্চর্য্য ! আজ সকালে মনে হয়েছিল, মাধুরী যদি আর আমাকে না চায়, তা হলে ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাক্‌ব। শুধু ওর স্মৃতিটুকু বুকে করে…নিজেকে কি ভুলই বুঝেছিলাম ! এত বড় প্রতারণা আমি নিজেকে কখনও কর্‌ব না।

—হাসি পায় যখন ভাবি, মানুষ কি ক'রে একটা মাথার কাঁটা, এক টুক্‌রো চুড়ি ভাঙ্গা কিংবা একটুখানি চুলের গোছা বুকে করে, স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে থাক্‌তে চায় !—যদি বাঁচি জগৎ আমায় এতখানি দুর্ব্বল কোনদিন দেখ্‌বে না।

—কিন্তু মাধুরীর ওপর সকল দাবী ছাড়্‌বার পূর্ব্বে বড় ইচ্ছা কর্‌ল একবার তাকে জীবনভরে অনুভব করে নিতে, তাই বল্‌লাম—মাধুরী ঐ বেদানাটা ছাড়িয়ে আমার মুখে দাওনা।

মাধুরী বেদানা ছাড়াতে লাগ্‌ল। কি সুন্দর ওর হাতের আঙ্গুল নাড়ার ভঙ্গী, বেদানার দানাগুলি ওর নখের রংএর সঙ্গে এক হয়ে গেছে !…

—ছাড়ান শেষ হলে একমুঠো দানা নিয়ে সে বল্‌ল—হাঁ কর।

—আমি তার হাতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেটি আমার মুখের খুব কাছে নেবে আস্‌ছে…নিঃশ্বাস ফেল্‌তে সাহস হয় না…কি জানি যদি তার বাধা পেয়ে তার হাতটা আর না নেমে আসে, ঐখানেই থেমে যায়…আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল…মুখের ওপর স্পর্শ পেলাম…কিন্তু সে ত তার হাত নয় !

—আমি মুখ বন্ধ করে নিয়েছি, দানাগুলি বিছানার চারধারে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

—মাধুরী বল্‌ল—মুখ বন্ধ করে নিলে যে?

—আমি বল্‌লাম—ইচ্ছা করল না,—থাক্।

১৫ই নভেম্বর।

—অনেক দিন কিছুই লেখা হয় নি। ইচ্ছাও ছিল না, তাছাড়া ডাক্তারেরও কড়া হুকুম ছিল আমি যেন কোন প্রকারে মনকে উত্তেজিত না করি।—যতই দিন যাচ্ছে, ততই একটী কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে আস্‌ছে—আমি বাঁচ্‌ব না।

—আমার ভাব্‌নাগুলোও যেন আর তেমন নেই। কারো সঙ্গে কারো বাঁধন নেই, সব ছেঁড়া ছেঁড়া, জড়ান, অস্পষ্ট ভাবে ভরা। দেহের কোন অংশ যেন আর নড়্‌তে চায় না। তারা যেন অনেক দিন পূর্ব্বেই মরে গেছে।

—আজ সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই চোখে পড়্‌ল, আমার পায়ের দিকের দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা Calender এর ওপর। তার তলায় লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা আছে—Do not burden your mind with the memory of the past.

—এ নিশ্চয়ই ঐ নার্সের কাজ। কাল ওটাত ওখানে

ছিল না!—খুব সম্ভবত ও আমাকে এক রকম—এক রকম কেন, ভাল করেই বুঝে নিয়েছে। আমি এত দিন ওর দিকে কোন লক্ষ্য রাখিনি কিন্তু এবার আমার এই খেয়া ঘাটের বাঁধন ছেঁড়্‌বার সময় চোখে পড়্‌ল—তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ একটী মানুষ, চেয়ে রয়েছে শুধু আমারই মুখের দিকে!

—বিশ্বাস করতে সাহস হয় না কিন্তু যখনই মনে পড়ে যায় ওর চাহনির কথা, বুকের ভিতর দপ্‌ দপ্‌ করে ওঠে—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে!

—আমাকে ঐ রকম হতে দেখে ও তখন ছুটে এসে বল্‌ল —অমন করছ কেন?

—আমি বল্‌লাম—তোমায় দেখে, বিস্ময়ে,—কে তুমি?

—সে বল্‌ল—আমি রমা!—আর কিছু না। ওর সম্বন্ধে শুধু ঐটুকুই জেনেছি—ও রমা।

—কাল যখন ওরা এসেছিল তখন ঘুমের মত একটা আচ্ছন্ন ভাব আমার দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল কোন কথা বল্‌তে পারিনি। ওরা আজকাল আমার দিকে কেমন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকে। যতক্ষণ আমার কাছে বসে থাকে আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি ওদের দেহ মনের ওপর দিয়ে যেন নির্য্যাতনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—সহ্য করতে চায় না, অথচ দূরে সরে যেতেও পারে না। ওদের বুক হতে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে—সে আমার দুঃখে নয়, আমার প্রতি ভয়ে।

—নার্স আমার মাথায় হাত রেখে বল্‌ল—তোমার কপালটা তেতে উঠেছে, বরফ দেব কি ?

—আমি বল্‌লাম—বরফ চাই না, তার চেয়ে তুমি বরফ জলে হাত ডুবিয়ে সেই ঠাণ্ডা হাত আমার কপালের ওপর রাখ।

—ও ভারী খুসী হয়ে উঠ্‌ল।—ওর দেহে যেন আনন্দ রাখ্‌বার আর যায়গা নেই, ওর হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে সে আনন্দ স্রোত আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল...

—আজ কেন জানিনা বড় বেশী করে মাকে মনে পড়্‌ছে, চোখে জল ভরে উঠ্‌ছে—আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌ছি না...

—নার্স আমার মাথার দিকের খাটের রেলিং এ ভর দিয়ে আমার মুখের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখ কিন্তু আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম না। কারণ আলোটা ছিল ঠিক্ তার পিছনে।

—তার ঈষৎ লাল্‌চে চুলের ভিতর দিয়ে সোণার গুঁড়োর মত আলো ঝির্ ঝির্ করে আমার চোখে এসে লাগ্‌ছিল। আমি তার মাথার উপর হাত রেখে বল্‌লাম,—রমা, তুমি কোন দিন পুরুষ মানুষের মুখের উপর মুখ রেখেছ ?

—আমার এই কথাটার ভিতর কোন সঙ্কোচ ছিল না, কিন্তু একটা ব্যর্থ বাসনার কান্না ছিল তা বুঝ্‌তে পারি, অথচ কেন যে বল্‌লাম তা জানি না !

—রমাও ঠিক্ আমারি সুরের প্রতিধ্বনির মতন বলে উঠ্ল —না, আমি রাখিনি, কিন্তু অনেকেই আমার কাছে ও জিনিসটার দাবী করে এসেছে। তার কারণ ওরা বলে আমায় দেখলে ওদের ঐ ইচ্ছা হয়, আমিও তাতে কোন বাধা দিই নি —কিন্তু আরো কিছু আমায় বল্তে হবে কি? তুমি শুনতে চাও কি?

—আমি তার মাথাটি আরো কাছে টেনে নিলাম, তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ আমার মুখে পেলাম। সে বল্ল—কিন্তু এবার আমার পালা এসেছে। আমার দাবী মিটিয়ে নেব এবার!

—তারপর, মাগো! কি শান্তি, কি সুখ, কি আগুনের স্রোত আমার দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেল! শিরা মাংসের বাঁধনে বাঁধনে টান পড়েছে!—ছিঁড়্ল—ভাঙ্গ্ল,—ডুবে গেল সব—জ্বলে গেল…

* * *

বিনয় বল্ল—আমার পড়া শেষ হয়েছে কারণ এর পর নিশীথের আর লেখ্বার শক্তি ছিল না, তা ছাড়া আমার মনে হয় বাকীটা তোমাদের না বল্লেও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

—তরুণ বল্ল—না না ভারী ক্ষতি হবে, সে ক্ষতি আমরা সইব না। যুদ্ধে সংহার কর্তে পার্লেই যুদ্ধ শেষ হয় কিন্তু গল্পে 'সংহারের' পর একটী উপদেবতার বন্দনা করতে হয় নইলে ভক্তদের রক্ত পিপাসা মেটে না, তুমি সেটাও সেরে ফেল।

বিনয় বল্‌তে আরম্ভ করল :—

প্রতিদিনের মত আমি সেদিনও সকালে নিশীথকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। সে আমার হাত ধরে হেসে বল্‌ল—সাবাস্ ডাক্তার! যমরাজাটাকে আচ্ছা জব্দ করে রেখেছ। কিন্তু আর কেন টানাটানি কর ভাই? আমায় ছিঁড় না, আস্ত ছেড়ে দাও—নিক্ আমাকে যম।

এই কটা কথা বলেই সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগ্‌ল। আমি তার হাত দেখে বল্‌লাম—সেই ভাল নিশীথ, আমিই হার মান্‌লাম। আর কোন কথা সে বল্‌ল না—আমি ফিরে এলাম।

—সন্ধ্যাবেলা রমা এসে বল্‌ল—ডাক্তার, তোমার সঙ্গে একটু কথা বল্‌তে চাই, তোমার সময় হবে কি?

আমি বল্‌লাম—এমন কিছুই করছি না যাতে তোমার কথা শুন্‌লে ক্ষতি হতে পারে।

রমা টেবিলের উপর থেকে 'ষ্টেথস্‌কোপ'টা তুলে নিয়ে সেটা কানে দিয়ে নিজেরই বুকের শব্দ শুন্‌তে লাগ্‌ল! তারপর সেটা রেখে আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বল্‌ল—তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কি কোন ওষুধের কথা লেখে না, যা নিশীথকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারে?

আমি বল্‌লাম—তোমাকে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারি না রমা।

সে আমার কথা শেষ না হতেই বলে উঠ্‌ল—না না সান্ত্বনা চাইছি না। শুধু ঐ কথাটা জান্‌তে এসেছিলাম তোমার কাছে। বলেই সে উঠে ঘর হতে চলে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। তারপর সেইখান থেকেই বল্‌ল—আচ্ছা কোন্‌টা সবচেয়ে কষ্টের? ভালবাসা না পাওয়াটা? না পেয়ে হারাণটা?

আমি বল্‌লাম—তোমার কথা আর একটু স্পষ্ট করে বল্‌বে না কি?

সে বল্‌ল—তার বিশেষ দরকার দেখি না। শুধু তোমার মতটাই শুন্‌তে চাই, কোন্‌টা বেশী দুঃখের?

আমি বল্‌লাম—না পাওয়াটা। যে পেয়েছে সে ত বেঁচে গেছে, তার ত আর কোন সংশয় রইল না মনে। হারিয়েও আর না পেয়েও সে ভাব্‌বে—পেয়েছি—তার সমস্ত কান্নার মধ্যে তাকে স্বীকার কর্‌তেই হবে, এক নিমেষের জন্যেও সে পরিপূর্ণতার স্বাদ পেয়েছে, ঐ তার সান্ত্বনা। কিন্তু যে পেল না, তার কি রইল? কি নিয়ে সে বাঁচে?

ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছিল এতক্ষণ তা বুঝ্‌তে পারি নি। আমি টেব্‌লল্যাম্প্‌টা জ্বাল্‌বার জন্যে হাত বাড়াতেই রমা বল্‌ল—থাক্ আমি চলে গেলে আলো জ্বেলো। তার হাত নাড়ার ভাবে বুঝ্‌লাম সে চোখটা একবার মুছে নিল। আমি বল্‌লাম—তোমার কি মনে হয় না ও-কথা?

সে বল্‌ল—সে যাই হোক্ ওতে কিছু যাবে আস্‌বে না; আমি এখন আসি।

রাত তখন দশটা হবে। রমা চলে যাবার পর হতে আমি সেইখানেই বসেছিলাম। কত কি ভাব্‌ছিলাম জানি না, এমন সময় খবর এল নিশীথের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এসেছে। আমি তখনই বেরিয়ে পড়্‌লাম।

আমাকে দেখে নিশীথের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠ্‌ল। আমাকে বিছানায় বস্‌তে ইঙ্গিত করে, সে মাথার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সেখানে রমা দাঁড়িয়ে ছিল। সে তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধর্‌ল।

নিশীথ ভাঙ্গা গলাটাকে একটু স্পষ্ট কর্‌বার চেষ্টা করে, রমার দিকে একবার তাকিয়ে আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে বল্‌ল—ও-আমার প্রাণ! জগতের পথের ধূলায় হারিয়ে ছিল ওকে পেয়েছি, চিনেছি···

রমা নিশীথের মাথার কাছে ব'সে দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে তার গলার উপর মুখ টিপে গুম্‌রে উঠ্‌ল—এই ভাল, এই ভাল এতদিন পরে আমার নারীত্বকে ফিরে পেলাম—আমাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখে গেলে···

* * * *

শরৎ বল্‌ল—ওকি, ঐখানেই থাম্‌লে যে?

বিনয় বল্‌ল—আর ত কিছুই বল্‌বার নেই।

—ঢের আছে। রমা তার পর কি করল? বিয়ে টিয়ে—

—না তা করে নি, সে এখনও সেই সেবার কাজই কর্‌ছে। সেবায় তার ক্লান্তি নেই, সব রোগীরই সে যেন 'মা'।

—আর সেই ভুঁইফোড় প্রণয়ীদ্বয়?

—প্রভাত আর মাধুরী ভালই আছে—বিয়ে হয়েছে।

—বাঁচা গেল, এতক্ষণ পরে কিনারা পেলাম। নাও এখন ওদের ম্যারেড্ লাইফটা সম্বন্ধে কিছু বল, মনটাকে হাল্কা করে নেওয়া যাক্।

—আমি ও-বিষয় খুব যে জানি তা ভেব না, তবে আমি ওদের ফ্যামিলি ডক্টর কিনা তাই প্রভাত খেয়ালের মাথায় মধ্যে মধ্যে আমায় কিছু বলে ফেলে। সেদিন সে বল্‌ল—মাধুরী আমার বুকের ওপর মাথা রাখ্‌তে গিয়ে শিউরে ওঠে…

সবাই বলে উঠ্‌ল—বাঃ বাঃ এই যে আর এক ট্রাজেডির সৃষ্টি। তারপর তারপর?

বিনয় বলল—জানি না।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে তরুণ আমায় বল্‌ল—আসল কথাটা কি জান? এই শীতকালটায় সাধারণত মানুষের স্বাস্থ্য একটু ভালই থাকে, কাজেই ডাক্তারগুলোর বেকার বসে থাকা ছাড়া অন্য উপায় নেই এই সুযোগে বিনয় একটু সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করে দিয়েছে। নিশীথের কথা বলে এতক্ষণ ও যে বকে গেল ওটা নিছক ওর 'বানান' কথা।

আমি বল্‌লাম সে না হয় হ'ল কিন্তু ও শেষ ব'সে পড়ে চায় না। জিগেস করলে বলে—জানিনা!

বিনয় হেসে বল্‌ল—দেখ্‌ছি আমারই ভুল হয়েছে ঐ 'মা? বলায়। না বল্‌লেই ছিল ভাল।

তরুণ বল্‌ল—এখন সে অনুতাপ করা একেবারে বাজে খরচ হচ্ছে বিনয়! "প্রভাত বল্‌ল—মাধুরী আমার বুকের ওপর মাথা রাখ্‌তে গিয়ে শিউরে ওঠে—" ঐ পর্য্যন্ত বলেই যদি থেমে যাও তাহ'লে একজনের কাছে মস্ত অপরাধ হ'বে! তা মনে রেখো।

বিনয় বল্‌ল—তা জানি, কিন্তু কি জান? এটা হ'চ্ছে অত্যন্ত 'কন্‌ফিডেন্‌স্যাল্‌' কথা। প্রভাত আমায় 'ট্রাষ্ট্‌' করেছে, তাই বল্‌তে একটু যা অনিচ্ছা। কিন্তু কি আর করি তোমাদের হাতে যখন পড়েছি তখন আর উপায় কি? কিন্তু সাব্‌ধান। এটা 'কন্‌ফিডেন্স্যাল বিটুইন্‌ আওয়ার এখন মাধুরীর নিজের কথা শোন।

* * * *

—সবাই বলে দুঃখ পেলে মানুষ শক্ত হয়। আমার কিন্তু দেখ্‌ছি ঠিক্‌ তার উল্টোটাই হ'চ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছি। অল্প একটু আঘাত পেলেই একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়ি! এ আঘাত শুধু যে বাইরে থেকে আসে

—ে নিজের কাছ থেকেও পাই। এবং এটাই বুঝি সহকর্মী
_র শক্ত।—কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারি না আমার
সেবায় দাষ! তাই এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করি। অথচ নিজেকে
াতে গিয়ে যে সমস্ত কথা বলি, তাতে, আমি যা প্রমাণ
রতে চাই তা হয় না!

—সন্ধ্যা বেলা ছাদ থেকে দেখ্‌তে পেলাম, মা, আমার ঘর হ'তে কি একখানা জিনিস হাতে করে বেরিয়ে গেলেন! তাঁকে আমার ঘরে ঢুক্‌তেও দেখেছিলাম, কিন্তু তখন তাঁর হাতে কিছুই ছিল না।

—আমি ঘরে আস্‌তেই প্রথমে আমার চোখে পড়্‌ল, আমার টেবিলের ওপর একটুখানি খালি জায়গার ওপর।—নিশীথের ছবিখানা ত ঐ খানেই ছিল? ওখানা আমার টেবিলের ওপর আছে দুবছরেরও বেশী, কিন্তু প্রায় ছমাস হ'ল ওকে ঐ জায়গা থেকে নড়াইনি।

—টেবিলের সমস্তটাই পরিস্কার, শুধু ছবিখানা যে টুকু ঠাঁই জুড়ে ছিল তারই ওপর অনেকখানি ধূলো জমে রয়েছে। কতকগুলো আল্‌পিন, একটা কালিমাখা নিব্‌, মাথার কাঁটা দু-তিনটে এই ধূলো মাখা জায়গাটার ওপর পড়ে রয়েছে। ঐ দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেন জানিনা আমার মন অত্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল! আমার ঘর হতে বেরিয়ে, মার ঘরে এসে দেখ্‌লাম, মা বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘরের আলো

নিস্তান। কিন্তু পাশের ঘরের আলো তাঁর ওপর এসে পড়েছিল বলে তাঁকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল।

আমি জিগ্‌গেস কর্‌লাম—তুমি ছবিখানা নিয়ে এসেছ মা ?

তিনি বল্‌লেন—হাঁ।

তাঁর কথার সুর সহজ নয়। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উত্তর দিলে যেমন হয় তেমনি।

আমি বল্‌লাম—ওটা আমার চাই—দাও।

তিনি বল্‌লেন—না।

তাঁর এই 'না' কথাটা এমন অস্বাভাবিক রকমের নির্ম্মম যে ওর ওপর কিছু বল্‌বার সাহস ও শক্তি আমার রইল না। আমার ঘরে ফিরে এলাম।

—আমি জীবনে এমন করে খুব অল্পই কেঁদেছি। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, বুঝি এ কান্না আর থাম্‌বে না।

—যতবারই ভাবি—মানুষ মারা গেলে, তার শব আর ঘরে রাখা চলেনা, কিন্তু তার ছবিখানাকে কি ঐ সঙ্গে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল্‌তে হবে ? ওকে রাখবার অধিকার কি আমার নেই ?—ততবারই মার ঐ ছোট্ট উত্তরটি পাই—'না'।

—কিন্তু—কেন ?

—সে দিন তড়িতা আমায় বল্‌ল—জগত শুদ্ধ লোককে আমি অবাক্ করে দিয়েছি !

—আমি জান্‌তাম আর সকলের মত সেও আমার বিচার

করতে এসেছে। তাই তাকে রাগিয়ে দিয়ে তার মনের সমস্ত বিষটুক নিজের গায়ে মেখে নেবার ভারি ইচ্ছে হল। বল্‌লাম —তাই নাকি? তাহ'লে আমার খুব বাহাদুরী আছে কি বলিস্?

—সে বল্‌ল—হাঁ, তা আছে বৈকি!—কিন্তু মাধুরী, এটা সত্যি যে তুমি আজ যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার দিকে তাকিয়ে কোন পুরুষ মানুষ কোন মেয়েকেই আর বিশ্বাস করবে না।

—এমনি গাল গলা ফুলিয়ে গম্ভীর ভাবে তড়িতা এই কথা-গুলি বল্‌ল যে না হেসে থাকতে পারলাম না। তাকে বল্‌লাম —প্রত্যেক মানুষ নিজের নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে এই ত জানতাম, কিন্তু তোমার কাছে আজ এক নূতন উপদেশ পেয়ে খুব খুসীই হ'লাম।

তড়িতা বল্‌ল—তোমার খুসী হওয়ার ওপর আমার অভি-[illegible]বার বা আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।—খুসীর সাগরে তোমার বান ডেকেছে, বাঁধ বাঁধ্‌বার চেষ্টাই এখানে পাগ্‌লামী।

সে একবার ঘরের চার দিকে ছুটে এসে আমার চোখের ওপর চোখ তুলে বল্‌ল—আচ্ছা মাধুরী, নিশীথের জন্যে কোন শোকই কি তোর মনে নেই?

—এই সব নির্ব্বোধদের সঙ্গে তর্ক করে কি লাভ? জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত এরা শুধু নভেল পড়েছে আর বায়স্কোপ্ দেখেছে।

তাই মানুষের জীবনটাকে এরা ঐ ছবির মতই দেখ্‌তে চায়। বই এর ছাপা অক্ষরে যে সমস্ত বর্ণনা আছে তার সঙ্গে না মিল্‌লে এদের মন ওঠে না।

—আমি সে রকমের কিছুই করিনি। তাই যেন এদের ক্ষমা এবং সহানুভূতির যোগ্যতা হারিয়েছি। তাই উঠ্‌তে বস্‌তে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আসে।

—কিন্তু নিশীথের সঙ্গে সম্বন্ধটা কি আমার, শুধু দু ফোঁটা চোখের জল আর কতকগুলো কথা দিয়ে প্রকাশ করবার জিনিস? ওর ভিতর দিয়ে হয়ত তড়িতার মত মানুষদের খুসী করতে পারতাম। কিন্তু শোক জিনিসটা কি শুধু বাই-রের লোকদের খুসী করবার জন্যেই আমাদের মনে থাকে? পাড়ার লোককে না শুনিয়ে কি কান্না হয় না?

—নিশীথকে আর কোন দিন দেখ্‌তে পাব না। এর ভিতর ত আর কোন সন্দেহ নেই। সে দুদিনের জন্যে আমাকে [illegible] যায় নি ত। মাটিতে মাথা ঠুকে ভাঙ্‌লেও ত সে আর ফিরবে না। এর বিরুদ্ধে কোন নালিসই যে আমার খাটবে না এটা ত সব চেয়ে বড় সত্য। তবু কেন ওরা এমন করে আমার বিরক্ত করতে আসে?

—তার ছবিখানা অযত্নে আমার টেবিলের ওপর পড়ে ছিল। মা সেখানা সরিয়ে নিলেন। তিনি আমায় কি ভাবেন?— পাষাণী? কিন্তু তিনি আর একটা কথাও যে ভাবেন তা

জান্তে পেরেছি তাঁর ঐ ছোট্ট 'না' কথাটি থেকে। ঐ 'না' হচ্ছে—'উচিত নয়।'

—আমার জীবন নদীর ওপর হতে নিশীথের ছায়া সরিয়ে দিয়ে যে প্রভাতালোক ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌ছে তাকে ঐখানে বরণ করে নিতে হবে।—কিন্তু এই যে আমার বুকের ভিতর অনবরত হাহাকার উঠ্‌ছে—ওগো পার্‌ব না—পার্‌ব না আমি, এ কান্না ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় কি ?

—প্রভাতও বুঝতে পারে না। না পারবারই ত কথা। তার মধ্যে যা' আছে তা সবটাই যে আলো। সবটাই যে হাসি গানে ভরা। অন্ধকার ত তার বুকে ঠাঁই পাবার নয়। তার চোখের দৃষ্টিতে সব অন্ধকার যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই সে যখন আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ওঠে আমার মুখেও হাসি ফুটে ওঠে, এ হাসি যেন ওর হাসিরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু আমার বুকের তলায় ঐ যে একটুখানি কালোছায়া লুকান রয়েছে সেখানে যে কোন আলো, কোন হাসি গান গিয়ে পৌঁছাতে পারে না।

—নিশীথকে দুটি বছর কাছে পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম না বলাই ভাল। কারণ সেই প্রথম দিন তাকে যতটুকু জেনে- ছিলাম শেষ দিনেও ঠিক ততটুকু তাকে জান্‌তাম, কিছু বেশী নয়। কি করে জান্‌ব ? সে ত কোন দিনই আমায় জান্‌বার অবকাশ দেয় নি। সর্ব্বদাই যেন কিসের একটা আবরণের

মধ্যে থাক্‌ত। সে আবরণ সরিয়ে তার মুখের দিকে তাকাবার ইচ্ছে করত কিন্তু সাহস পাই নি। কিন্তু একটি দিনের জন্যেও যদি এ সাহস আমার হত। একটি দিনের জন্যেও যদি তার যথার্থ রূপটিকে দেখ্‌তে পেতাম।

--তাকে আমি জানি নি, তাই তার সম্বন্ধে আমার কিছু বল্‌বারও নেই। শুধু দু'একটা ঘটনার কথা, যা নিয়ে আমি দিন কাটাচ্ছি, যাকে আশ্রয় ভেবে বুকের ওপর আঁক্‌ড়ে ধরে আছি তাই লিখে রাখ্‌লাম এখানে—

--সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। কেন জানি না, সন্ধ্যাবেলা বিশেষ করে যেন তারই জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে ছিলাম। সাম্‌নের টেবিলের ওপর বিস্তর উপহার সাজান ছিল, আমি সেই সব দেখ্‌ছিলাম এমন সময় সে এল।

—তাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই সে আমার হাতে একটা ছোট বাক্‌স দিল। আমি জিগ্‌গেস কর্‌লাম—কি আছে?

সে বল্‌ল—দেখ।

আমি বাক্‌সটা খুল্‌তেই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল—ওটা দাও ত একবার, ভারি ভুল হয়ে গেছে।

সে বাক্‌সের ভিতর হতে একটা ব্রোচ্‌ বার করে তারই সঙ্গে যে সুতো বাঁধা কাগজটা ছিল তা ছিঁড়ে ফেলে ব্রোচ্‌টা আমার হাতে দিয়ে বল্‌ল—এটা হয় ত তোমায় মানাবে, দেখত প'রে।

ব্রোচ্‌টা আমি হাতে নিলাম কিন্তু আমার চোখ গিয়ে পড়্‌ল

ঐ কাগজ টুক্‌রোর ওপর। সেটা আমার পায়ের কাছেই পড়ে ছিল। লালকালিতে তার ওপর লেখা আছে—বাইশ শ' টাকা!

—ব্রোচ্ পরার সমস্ত ইচ্ছে আমার মন হ'তে চলে গেল। সেটাকে দেখ্‌বার ইচ্ছেও রইল না, আমি সেটা বাক্‌সে বন্ধ করে টেবিলের ওপর রেখেদিলাম।

—কিন্তু সে আমায় কিছুই বল্‌ল না। আমার ভাল লাগা বা না লাগা কিম্বা ওটা পরা বা না পরার সঙ্গে যেন তার কোনই যোগ নেই। দেওয়াই ছিল যেন তার কাজ দিয়েই সে নিশ্চিন্ত।—

—সে আমার সাড়ীর আঁচলের কোন্‌টি একবার ছুঁয়েই আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে টেবিলের ওপরকার জিনিসগুলি দেখ্‌তে বসে গেল।

—সবার মুখে শুন্‌তাম—নিশীথ আমায়—মাগো সব সত্যি [illegible]...কিন্তু এটা যেন না সত্যি হয়। তা'হলে জগতের সমস্ত আলো আমার চোখ হ'তে নিভে যাবে।

—সে আমায় কিছুই বলেনি। আমিও তাকে কিছুই বলিনি। আমাদের সংসারের সমস্ত অভাব সে ঘুচিয়েছিল। সে যেন আমার মায়েরই বড় ছেলে। তাই তাকে আমি নিশীথ বলেই ডাক্‌তাম, সে আমায় বল্‌ত—মাধুরী। 'এর বাইরে একদিনের জন্যেও সে যায় নি, আমিও না।

—কিন্তু কত দিন তার চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

ভেবেছি—ঐ মানুষটার মন ব'লে কি কিছুই নেই? সময় সময় ইচ্ছে হ'ত তার ঐ আবরণটাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে, তার ভিতরের মানুষটিকে টেনে বার করে আন্‌তে!

—যাক্। যা করিনি তার জন্যে খেদ করে লাভ নেই। তাকে জানা হ'ল না। সে আমার অজানাই রয়ে গেল চিরদিন। ক্ষতি কি?

—কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য করেছে আমায় ঐ নার্সটি! সেদিন নিশীথকে দেখে যখন ফির্‌ছিলাম, সিঁড়ির কাছে একটা ঘরের সাম্‌নে সে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে এসে সে আমার হাত ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল!

আমি বল্‌লাম—কি দেখ্‌ছ?

সে বল্‌লে—তোমাকে।

আর কোন কথা না বলে সে ঘরের ভিতর চলে...

আমার বুকের ভিতরটা যে কি করে উঠ্‌ল তা লিখে জানাব কি করে? ও যেন নিশীথেরই আর এক মূর্ত্তি!

—তার পর যে কি লিখ্‌ব তা ভেবে পাচ্ছিনা। না, এই বারেই বুঝি সব স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল! কিছুই আর ঢাকা রইল না। সবই আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি।

—নিশীথ আমায় ছেড়ে গেল কিন্তু প্রভাতকে দিয়ে গেল আমার হাতে। ও নিশীথের ভাই। আশ্চর্য্য! অথচ এই

দুবছরের মধ্যে একদিনও জান্‌তে পারিনি ওর কোন ভাই বা আর কেউ আছে!

—ঐ এক আশ্চর্য্য মানুষ! একেবারে নিশীথের বিপরীত! একটি দিনের আলাপে সে যেন আমাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলল!

—তার কোন কথাই আমার অজানা রইল না। ফুলের দিকে তাকালে যেমন তার সম্বন্ধে সব কথাই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যায়, প্রভাতের মুখের দিকে তাকালে তাই হ'ত। সে ফুলেরই মত নির্ম্মল—জটিলতা শূন্য।

দুপুরবেলা নিশীথের একখানা চিঠির সঙ্গে প্রভাতের চিঠি মিলিয়ে দেখ্‌ছিলাম—কি আশ্চর্য্য রকমের বিভিন্ন সুর!

নিশীথ বল্‌ছে—মাধুরী আমার জীবনে সব চেয়ে সুখের দিন হবে সেইটি, যে দিন তোমাকে দেখ্‌ব, তোমার নিজের আসনে এসে বসেছ। তোমার এ আসন তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে। বাইরেটাকে দেখ্‌তে আরম্ভ কর মাধুরী। কোন খানটা যেন তোমার দৃষ্টি না এড়িয়ে যায়...

প্রভাত বল্‌ছে—প্রিয়া আমার প্রিয়া! আজ দুদিন (আট চল্লিশ ঘণ্টা !!!) তোমায় দেখি নি! সময় নেই বলে কেবলই আমায় দূরে সরিয়ে রাখ্‌ছ। কিন্তু এবারও যদি ঐ উত্তর পাই তাহ'লে জেনো আমি তোমার জানালার ঠিক নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। লোকে হাস্‌বে? হাসুক্ না—আমি ভয় করি না।

তোমাকে না দেখার দুঃখের চেয়ে ওদের হাসি আমায় বেশী কষ্ট দিতে পার্‌বে না। কেন তোমায় দেখ্‌তে পাব না? তোমার · নিমন্ত্রণের অপেক্ষা এবার থেকে আর করব না।…

—এই নিশীথ আর প্রভাত ;—একজন আমাকে, আমারই হাতে ছেড়ে দিয়ে মুক্তির মধ্যে রাখ্‌তে চায়। আর একজন আমার যা কিছু সবই ডুবিয়ে দিয়ে নিজের মত করে আমাকে গড়ে নেবার জন্যে অস্থির হ'য়ে উঠেছে। এ না হ'লে যেন তার জীবনটা সব বৃথা হয়ে যাবে! তাই সে আর সবুর করবে না। আমাকে তার পেতেই হবে।

—কাল আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম! কিন্তু জানতাম না, যে অত সকাল সকাল এসে পড়্‌বে। তাই ঠিক তৈরী ছিলাম না।

—মাটিতে বসে আমার একখানা কাপড় সেলাই করছিলাম এমন সময়ে সে ঘরে এল। তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে রাখ্‌তে যাব, সে বল্‌ল—থাক্‌না ঐ রকম সব ছড়ান। অসম্পূর্ণ কাজ দেখ্‌তে আমার খুব ভাল লাগে। খানিক্‌টা হ'য়েছে, খানিক্‌টা হয় নি। এই ধরণের ছবিও আমি বড় ভালবাসি। একেবারে শেষ হয়ে গেলে, কর্‌বার ত আর কিছুই থাকে না, ভাব্‌বারও না। যার সম্বন্ধে কিছু ভাব্‌বার নেই, কর্‌বার নেই তাকে নিয়ে কি করব?

আমি বল্‌লাম—অর্থাৎ তুমি চাও না যে কোন কিছু শেষ হয় ?

সে বল্‌ল—হাঁ নিশ্চয়ই। শেষ হলেই ত সব চুকে বুকে গেল। শেষ হতে দেবো না—বলেই সে আমার কাপড়ের খানিকটা সেলাই খুলে দিল।

—আমি বল্‌লাম—তুমি ভারি দস্যি ছিলে না ? আমিও ছোট বেলায় বড় দুষ্টু ছিলাম। স্কুলের গাড়ীর ভিতর থেকে আধখানা খাওয়া পেয়ারা ছুঁড়ে ছেলেদের মারতে আমার খুব ভাল লাগ্‌ত।

—আমার কথা শুনে প্রভাত বল্‌ল—শুধু এই ! এরই নাম বল্‌তে চাও দস্যিপনা ? আমার কথা কিছু শোন, অবাক্ হয়ে থাক্‌বে।—সাইকেল করে মেয়ে স্কুলের গাড়ীরপিছনে পিছনে ছোটা ত ছিল আমার একটা প্রধান কাজ। এক দিন ঐ রকম ছুটতে যেতে দেখ্‌তে পেলাম ঝিল্‌মিলির ভিতর দিয়ে একটি মেয়ের বেনীর খানিকটা ঝুলে রয়েছে। দেখামাত্র কি করতে হবে, তা ঠিক হয়ে গেল। সাইকেলটাকে গাড়ীর গা ঘেঁসে চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ঐটাতে একটা হেঁচ্‌কা টান মেরে পালাব এই ইচ্ছা ছিল আর কি ! হাতটি সবে বাড়িয়েছি অমনি মাথার ওপর—ঠকাৎ ! উঃ বাপ্‌রে ! ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে এসে দেখি একটা ফুটবলের মত গোল মুখ খিল্ খিল্ করে হাস্‌ছে আর তার হাতে একখানা ফুট্‌রুল।

—এমনি সহজ ভাবেই সে সব কথা বলে। তার মনে যেন কোথাও কোন ভার নেই! সবটাই হাল্কা। ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে আমি যেন নিজেকে ভুলে যাই। ওর সঙ্গে ঐ রকম কত মাথামুণ্ডহীন কথা যে কি করে আমিও বকে যাই তা ভাব্‌লে আমারই আশ্চর্য্য লাগে।

—আমি খোলা সেলাইটাকে আবার সেরে তুল্‌ছি—কিন্তু হাত ভয়ানক কাঁপ্‌ছে, বুকটাও! ছুঁচ্‌ ফুটে ফুটে আঙ্গুল দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। কাপড়ের দুই এক জায়গায় তার দাগও পড়ল।

প্রভাত আমার সেলাইএর বাক্স থেকে কাঁচিটা বার করে নিয়ে আমার পায়ের আঙ্গুলের নখ কাট্‌তে আরম্ভ করে দিল!

—শিউরে উঠ্‌লাম তার স্পর্শ পেয়ে। পা সরিয়ে নিতে গেলাম কিন্তু পারিনি! মানুষের হাতে এত যাদু থাকে? চোখ বুজে বসে রইলাম। প্রভাতের হাতের কাঁচি কিন্তু বেশ সমান ভাবে চলেছে, তার কথারও বিরাম নাই—কি বল্‌ছিল সে কিছু মনে নাই, কিন্তু শুন্‌ছিলাম সমস্ত মন দিয়ে।

সব নখ কটি কাটা হ'লে সে হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—বলেছি ত তোমার আর নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় বসে থাক্‌ব না। তোমার প্রতিজ্ঞা—দেবে না। আমার প্রতিজ্ঞা—নেবো।—দেখা যাক্‌।

আমি কেঁদে ফেল্‌লাম। সে ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল—কষ্ট দিলাম তোমায় মাধুরী !

আমি বল্‌লাম —না। কিন্তু কি চাও তুমি ?

সে আদর করে আমার কপালে হাত বুলিয়ে বল্‌ল—আজ নয় ; কাল বল্‌ব তোমার। সূর্য্য ওঠ্‌বার পূর্ব্বেই তোমার কাছে এসে দাঁড়াব, আমার যা চাই তা নিতে।...

—রাতও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু এখনও শুতে যেতে পারছি না ! কি করব আমি ? নিশীথ—ওগো পাষান দেবতা আমার ! শুধু বলে দাও—কি কর্‌ব আমি ? একবার তোমার ঐ আবরণ সরিয়ে আমার মুখের দিকে চাও, দেখ্‌তে দাও তোমাকে একবার। শুন্‌তে দাও তোমার মুখে—আমার ঠাঁই কোথায়। খুঁজে খুঁজে যে আর পারি না। বুক যে ভেঙ্গে পড়ল ! তুমি যবে থেকে বলেছ বাইরেটাকে দেখ্‌তে, তবে থেকেই যে আমি তাকিয়ে বসে আছি। আমার ঠাঁই আছে কি ? মেয়ে মানুষের ঠাঁই বলে কিছু আছে এ জগতে ? ঐ কথাটি শুধু তোমার মুখে শুন্‌তে চাই। আর কিছু না—বল আমায়—বল্‌বে না ? তবে কি করে বুঝ্‌ব আমি ?

—ঐ প্রভাত কি আমার ঠাঁই ?—আমার গতি ? তবে আরো কত মানুষ কেন আমার কানে ঐ একই কথা শুনিয়ে গেল ? আমি কি তাদের কেউ নই ?

আমাকে যারা বুক পেতে নিতে এল আমি তাদের দিলাম

অবহেলার বিষ টুকু ! ঐ বিষ পান ক'রে তাদের যে দীর্ঘশ্বাস অহরহ হাহা করে বয়ে যাচ্ছে তার তাপে যে জ্বলে গেলাম—মরে গেলাম।

—তুমি বলে ছিলে—আমি যে দিন আমার আসনে এসে বস্‌ব সে দিন তুমি সুখী হবে। এ সুখ তোমায় দিতে পার্‌লাম না যে। আমার ঠাঁই যে পাই নি আমি।—কাল ও আস্‌বে—কাল··· মাঝে আর এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাকি !—বল না গো, একটু ইঙ্গিত করে আমায়—কোথায় আমার ঠাঁই—মাগো কি ভয়ানক অন্ধকার !—কি ভয়ানক একা আমি...!

* * * *

পড়া শেষ করে বিনয় বল্‌ল—এবার শেষ কর্‌তে পেরেছি, না এখনও বাকি আছে ?

শরৎ বল্‌ল—থাক্‌লেও আর শুন্‌তে চাই না। তোমার বিদ্যের দৌড় বোঝা গিয়েছে। সব শেয়ালেরই এক রা—কবি বলে গিয়েছেন মেয়েদের উদ্দেশ করে ঃ—

তোমারে পাছে সহজে বুঝি—
তাই কি এত লীলার ছল ?
বাহিরে যবে হাসির ঘটা—
ভিতরে থাকে আঁখির জল।

তাই প্রমান কর্‌বার জন্যে ডাক্তারী ছেড়ে খেটে মর্‌ছ, কিন্তু যতই কর, মুনফা কিছু পাবে না।

তরুণ বল্‌ল—ভাব্‌ছি, মরে যাওয়াটা যদি কাশী গয়া যাওয়ার মত হত আর আমার ব্রাহ্মণীটি যদি ছুটি দিতেন, তাহলে মরে গিয়ে একবার নিশীথকে বলে আস্‌তাম—মাধুরী এত বড় জগত-টায় 'একা' মনে করে,—তুমি নেই বলে। তোমার জন্যে তার চোখে জল ভ'রে ওঠে···

# শ্রীপতি

আজ সকালে কল্‌কাতায় এসেছি। বাবাকে এতকরে বল্‌লুম, 'হোষ্টেলেই থাক্‌বো, তিনি কিছুতেই বুঝ্‌লেন না। বল্‌লেন, কল্‌কাতায় হোষ্টেলে ও মেসে কেবল আড্ডা আর বকামি। 'শশাঙ্ক আমার ছেলেবেলার বন্ধু, হাইকোর্টের উকিল, তোকে নিজের ছেলের মতনই রাখ্‌বে।

এতদিন জেলার কলেজ-হোষ্টেলে কেটেছে—এবার এক অপরিচিত পরিবারে থাক্‌তে মনটা উৎসুক আনন্দ শঙ্কায় কাঁপ্‌ছে।

মোটা মোটা ল-রিপোর্টভরা আল্‌মারি, নথির তাড়া আর মক্কেলের দলে ঘেরোয়া হয়ে শশাঙ্কবাবু বসেছিলেন, নমস্কার করে দাঁড়ালুম। কয়েকমিনিট পরে কাঁচকড়ার বড় চশ্‌মার কাচের ভেতর দিয়ে চোখ তুলে চাইলেন, আবার নমস্কার করে পরিচয় দিলুম। একটু হেসে বল্‌লেন, ও তোমার বাবার চিঠি পেয়েছি, আরে কেষ্টা একে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা। তারপর নথির সাগরে অতলে তলিয়ে গেলেন।

চাকরটা বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলো, আমি চলেছি, দুইধার থেকে মেয়েরা ঘোমটা টেনে ঝঞ্ঝাভীত পাখীর মত পথ থেকে

পালিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। একটা বড় দালানে বাড়ীর গিন্নি বসেছিলেন, তিনি দেখ্‌তে অপরিমিতরূপে মোটা ও অশোভনভাবে ফর্সা। রাশ রাশ আলু বেগুন পটল কুম্‌ড়োর মাঝে বসে লালপাড় সাড়ি পরে একজন তরকারি কুট্‌ছিলেন, আমাকে দেখে তাঁর ঘোম্‌টা প্রায় বঁটির মাথায় গিয়ে ঠেক্‌লো, আর এক-দিকে দুইজন মহিলা ছোট ছেলেমেয়েদের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, তাঁদের মাথার কাপড়ও দুধের বাটীর ওপর এসে পড়্‌লো। গিন্নি মাথার আঁচল টান্‌লেন, দূরে দুটো ঝি মাছকোটা থামিয়ে মাথার কাপড় টান্‌লে, রান্নাঘরের দরজার আড়ালে শ্বেতবসনা বর্ষীয়সীদের মুখ দেখা গেলো, একটা কি গোলমাল চল্‌ছিলো, আমি আসাতে সব চুপচাপ। মূক স্থির অবগুণ্ঠনবতীদের রাজত্বে এমন করে এসে পড়ে ভারি অপ্রস্তুতে পড়্‌লুম—এদেশে আমার প্রবেশের পথ কোথায়? সাদা কাপড়ের পুঁটলীর মত এই অন্তঃপুরিকারা বসে থাক্‌বেন, কলের পুতুলের মত কাজ করে যাবেন, প্রতিদিনের ক্ষুধার আহার তৃষ্ণার জল যাঁরা দেবেন তাঁদের দেখা কোনদিন মিল্‌বে না। যে অন্তরের স্নেহ-সুধা দিয়ে প্রতিদিনের অন্ন ব্যঞ্জনকে এঁরা অমৃতময় করে দেবেন সে অন্তরের মুখোমুখি পরিচয় হবে না। যাঁর হাতের কাটা ঝোলের আলু তরকারির পটল, অম্বলের বেগুন রোজ খাবো তাঁর স্বর্ণ-বলয়মণ্ডিত শোভন মঙ্গল হস্ত কোনদিন দেখ্‌বো না। ভাব্‌ছি, এদিন ধরে কোন পরিবারে থাকার মধ্যে সুখের চেয়ে ব্যথা

বেশী। ঘরের ভাতকে মেসের ভাত করে তুল্লে গৃহলক্ষ্মীর কত বড় অপমান।

একটা মেয়ে দুধ খাবেনা বলে বিদ্রোহ করে কেঁদে উঠ্লো। বাঁচ্লুম। একটু এগিয়ে গৃহিণীকে প্রণাম করতে যাবো ভাব্ছি, তিনি বল্লেন, থাক্ থাক্ হয়েছে, ওইখান থেকেই করো, ছুঁয়োনা, এই চান করে এলুম—ওই পিঁড়েটায় বোসো. আরে কেষ্টা ওর জন্যে ত ঘর ঠিক হয়েছে. সেই ঘরে নিয়ে যানা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কি

আমার দম্ আট্‌কে যাচ্ছিলো, তাড়াতাড়ি কেষ্টার সঙ্গে ঘরের দিকে চল্লুম।

গিন্নি গর্জ্জন করে উঠ্লেন, না[illegible], নালি, আ, মেয়ের আবার লজ্জা দেখো. সাত হাত ঘোমটা টানা হয়েছে. যা ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়- ওইটি আমার ছোট মেয়ে—

বাঁচা গেলো। একটা সাদা পাথরের মূর্ত্তি সজী[illegible] স্বাধীন হয়ে উঠেছে। নীলিমা ঘোমটা খুলে আমায় প্রণাম করবে কি না ইতস্ততঃ করে একটু এগিয়ে এলো. আমি আর তাকে প্রণাম করবার সুযোগ না দিয়ে এগিয়ে চল্লুম!

ঘরে এসে যেন ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়্লুম। হঠাৎ গিয়ে পড়াতে যতগুলি মুখ নীরব হয়েছিলো, চলে আসাতে ততগুলি মুখ মুখর হয়ে উঠ্লো। গিন্নির গলা সব গলা, ছাড়িয়ে কানে এসে বাজ্‌তে লাগ্লো। এদের

নিত্যকার সংসার উৎসবে এই গলাবাজিটা বোধ হয় রসুন-চৌকি।

—কি গো সব যে একেবারে পাষাণ প্রতিমে হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে—আজ কি বাবুরা উপোষ করে আফিসে যাবে—হাঁ মেজবৌ খালি আলুই কুট্‌ছো, আলুই কুট্‌ছো, বলি আলু দিয়ে কি আমার পিণ্ডির ছারাদ্দ হবে? ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে গেল। শাকের বোঝা গাদা করা হয়েছে কিসের জন্যে? ঝাদের জন্যে? হাঁ, তাঁদের যে লম্বা লম্বা মুখ হয়েছে। তারি: কোথায় গেল তারি পিসির বামুনের কাছে পাঠিয়েছে—চোদ্দ-পুরুষের পিসি—বলি নিমি, তোকে না বললুম সব কাজ ফেলে রেখে ঘর মুছে আয়, গ্রাহ্য হলো না, ওগো এখনো চোখ আছে, চোখের মাথা খাইনি—চালগুলো দেখ দেখি কি বা'ল রয়েছে। নাও বৌমা, এখন ছেলেকে দুধ খাওয়াতে বসলেন—আজ আর রেঁধেও কাজ নেই, খেয়েও কাজ নেই, উনুন যে জ্বলে গেল, না বাপু আমি আর পারি না—নিমি পোড়ামুখী কোথায় গেল, মাছগুলো কি কাকে—হুস্—হুস্—তাড়াও বৌমা, মাছটা নিয়ে গেল—নিমি, নিমি, না—কাক তাড়ানো কি আমার কাজ, পড়ে মরেছিলুম আর কি—কাকগুলোর কি বজ্জাতি বুদ্ধি দেখ না—নচ্ছার বেটা—বলি নিমি আজ কি ছেলেরা নিরমিষ খেয়ে ইস্কুলে যাবে আর তোদের পাতে দাগা দাগা মাছ পড়বে—তোদের ঘাড়ে আজকাল কটা করে মাথা গজিয়েছে? চাল ধুয়ে

ত নিয়ে এলি, বামুনের মেয়ে খাবে তার হুঁস্ আছে ? গঙ্গাজল দিয়ে কল ধোয়া হয়েছে কি ?

এদের সংসারে গাড়ীটার চাকাগুলোর একটু বেশি রকম শব্দ হয় দেখ্ছি। বৌঝিদের জন্তে গিন্নি গাড়ীখানি যে রকম করে হাঁকিয়ে চলেছেন ছিপটির শব্দটা বড্ড বেশি রকম শোনাচ্ছে—কিন্তু কর্তারা এমনি নিশ্চিন্ত ভাবে আরামে গাড়ীর ভিতর দলিল পত্র নিয়ে পড়ছেন এদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিকেল বেলায় নীলিমা দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি রাতে কি খাবেন, বৌদি জিজ্ঞেস করে পাঠালেন। হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললুম, কি খাই বলত ? সকালে যে সাত হাত ঘোমটা টেনেছিল বিকেলে সে মাথায় কাপড় না দিয়েই চলে এসেছে। আমি চাইতেই মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বল্লে, আমি কি জানি আপনার যা ইচ্ছে—

—তুমি কি খাও রাতে ?

—আমরা ভাতই খাই।

—তবে আমিও তাই খাব।

ধীরে সে চলে যাচ্ছিল, তার দিকে আবার চাইতেই একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, কিছু বল্‌লেন। আমি মৃদু হেসে বল্‌লুম, না।

বাবা যখন জোর করে এখানে পাঠিয়েছেন ভাব্ছি নিশ্চয় দুই বন্ধু মিলে একটা ষড়যন্ত্র করেছেন. একটা চক্রান্ত আছে দেখ্ছি। মেয়েটি যে দাদা বলেনি—দাদা হওয়ার বোঝা ও গুরুত্ব্ত কম নয়। দাদার মত কর্ত্তব্য অধিকার যদি এখানে খাটাতে চাই তবে এ পরিবারের সঙ্গে একটা ঝগড়াই হয়ে যাবে।

এক দিন কলিকাতা বাসেই অন্তর যেন শুকিয়ে গেছে; বর্ত্তমান সভ্যতা লক্ষ্মী এই পাষাণপুরীতেই তাঁর স্বর্ণ দেউল তুলেছেন—কিন্তু ভারতের সভ্যতা চিরকাল হোমানলপূত তপোবনে, স্নিগ্ধ শ্যাম পল্লীকুটিরে গড়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে এ যেন মাতা নয়—এ পাষাণী ধাত্রী। আমার ঘরের পাশে একটা নারিকেল গাছের মসৃণ পাতাগুলোর উপর চাঁদের আলো ঝিকিমিকি কর্ছে আর একধারে কৃষ্ণ চূড়ার গাছের লাল ফুল-গুলি আগুনের শিখার মত লাল হয়ে উঠেছে—শুধু তাদের দিকে চেয়েই এই শান্তি পাচ্ছি—মানুষের জীবন কেবল অর্থের জন্য হানাহানি, কাড়াকাড়ি, ঝগড়া, অশান্তি নয়—কেবল নশ্বর জগতে কীটের মত বাস করতে সে জন্মায় নি—কুট্নো কোটা বাট্না বাটা রান্নাঘরে তার চরম সার্থকতা নয়—জগতের সৌন্দর্য্যালোকে মহা আনন্দের উৎসবে সে আমন্ত্রিত।

২

নীলিমার সঙ্গে একটু একটু করে ভাব হচ্ছে—আজ এসে

ঘরের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, বৌদি জিজ্ঞেস করলেন আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না ত ?

—আমার কষ্ট ? বেশ আরামে আছি, চা'র বার চর্ব্বা চোষ্য খাচ্ছি। সে চলে যাচ্ছে দেখে ডাকলুম, বললুম, এসো একটু গল্প করা যাক্। ঘরের ভেতর ঢুকে থমকে দাঁড়াল, বললুম, দাঁড়িয়ে রইলে যে, চেয়ারটায় বসো না। নীলিমার সেই বিস্ময় ভরা মুখ কখনো ভুলবো না। চেয়ারে বসবে ? জুতো ছাতার মত চেয়ারটাও ত মেয়েদের জন্য সৃষ্টি হয়নি। বললুম, বসো না, তাতে দোষ কি ? চেয়ারটা এগিয়ে দিলুম, সুতরাং তাতেই জড়সড় হয়ে বসলো।

তারপর কি কথা কওয়া যায় ? নীলিমা তার মায়ের মত স্থূলকায় নয় বটে, কিন্তু মায়ের সুন্দর রং সে পেয়েছে। একটা অস্বাভাবিক লজ্জার ভান করে, তা সে মোটেই পছন্দ করে না —কিন্তু বাড়ীর দস্তুর বলে ত্যাগ করতেও পারে না। চঞ্চল সতেজ প্রাণ তার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু সে প্রাণের খেলা বাইরে প্রকাশ করবার পথ নেই—বাধাও বিস্তর !

ভেবেছিলুম অনেক গল্প করবো কিন্তু বুঝলুম তার অসোয়াস্তি হচ্ছে। মানুষের মনের বন্ধঘরের সকল দরজা যে চাবি দিয়ে খোলা যায়, সে প্রেমের চাবি, সহানুভূতির চাবি, ওর মনের বন্ধ কবাট সেই চাবি দিয়ে খুলে অন্তরের আনন্দ-দীপ্ত ঘরগুলি দেখে নিতে ইচ্ছে হলো কিন্তু সাহস হলো না।

বল্লুম, তোমার কোন কাজের ক্ষতি হচ্ছে না ত, তাহলে—ধীরে সে আপনি উঠে পালাল।

৩

এ বাড়ীতে অবগুণ্ঠিতাদের মধ্যে যেমন অপ্রস্তুত হয়েছিলুম ওদিকে অতুলের সঙ্গে একেবারে বিলাতফের্‌তাদের দলে আমার অবস্থাটা ঠিক তেমনিই হলো।

কলেজের সব ছেলেদের মধ্যে অতুলের সঙ্গে কেমন খুব ভাব হয়ে গেছে। এক চঞ্চল তেজে সহজ প্রাণের বিকাশে সে আমাকে মুগ্ধ করেছে। তার বাবা ও আমার বাবা নাকি সহ-পাঠী ছিলেন, একসঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে পড়েছিলেন।

অতুল আজ কিছুতেই ছাড়্‌লে না—আমাকে তাদের বাড়ী টেনে নিয়ে গেল। গোলাপ, হাস্‌নাহানা ও কত বিলাতী ফুলের সাজানো বাগান পেরিয়ে এক বড় বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছলুম। সন্ধ্যার আলোয় লাল বাড়ীতে কে যেন আবীর ঢেলে দিয়েছে, আর এক মিষ্টি টুং টুং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গাড়ী দাঁড়াতেই ড্রইংরুম থেকে অতুলের মা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। নেমে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি বল্‌লেন, ও, কত সৌভাগ্য আমাদের তুমি এসেছ, এতদিন এখানে রয়েছ অথচ আমাদের এধার দিয়ে এলেই কি তোমার পড়ার ক্ষতি হত না জাত যেত—অতুলকে আমি কতবার বলেছি, সে বলে—তুমি আস্‌তেই চাও না। কি উত্তর দেব ভেবে উঠ্‌তে

পারছিলুম না, তারপর তাঁর সাজসজ্জার দিকে চেয়ে মাথাটা একটু ঘুলিয়ে গেল। কালো কেশের মধ্যে রূপার সুতার মত কয়েকটি চুল ঝক্‌মক্ করছে। তিনি অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, অতুল বলে তুমি আসতে চাও না—কি গাড়োয়ান কত ভাড়া বলে—এক টাকার এক পয়সা বেশি দেবে না—ডাকাত হয়েছে আজকাল গাড়োয়ানগুলো—কর্পোরেসন করে কি ? ভাড়া ঠিক রাখতে পারে না ?—বয়, বয়, ডাবপানা লাগা ? ঘরমে—আচ্ছা। চল ড্রইং রুমেতে বসবে—অতুল তুমি শীঘ্র কাপড়টা ছেড়ে এস।

মিসেস রায় আমাকে ধরে ড্রইং রুমে নিয়ে গেলেন। পশ্চিম কোণে এক তরুণী বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন—সান্ধ্য-সূর্য্যের রক্তাভা তাঁর মুক্তকেশ দীপ্তমুখ শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। আমি ঢুকতেই পিয়ানোর শব্দ থামলো, মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠলেন।

—ইনি হচ্ছেন তোমার দাদার class friend আমাদের Mr. Dasএর ছেলে।

ও আপনি, বলে মেয়েটি ধীরে নমস্কার করলে, আমিও কোন রকমে মাথাটা হেট করে প্রতি নমস্কার করে দাঁড়ালুম।

—বসো তুমি—এঁর সঙ্গে গল্প কর ডলি আমাকে আবার এখুনি যেতে হবে Mrs. Senএর বাড়ী, Mrs. Bompas আসবেন—না ; গেলেই নয়—তোমার সঙ্গে আজ বেশি কথাবার্ত্তা

কইতে পার্‌লুম না, আর-একদিন তুমি নিশ্চয়ই আস্‌বে। Mr. Rayএর সঙ্গেও বোধ হয় দেখা হবে না, ক্লাব থেকে ফির্‌তে তাঁর রাত হবে। ওঁকে চা না খাইয়ে ছেড়ো না ডলি, আমি চল্‌লুম।

একটি মূক মূর্ত্তিকে বসিয়ে মিসেস রায় চলে গেলেন। অতুলও আস্‌চে না দেখে বড় রাগ হলো। এ তরুণীর সঙ্গে কি আলাপ করা যায়? 'এটিকেটের' কুস্তিগিরি আমি মোটেই জানি না। যদি সহজ সরলভাবে প্রাণ খুলে মিশি হয়ত সভ্যতার কোনো আদবকায়দায় বাঁধ্‌বে। বেশ অনুভব কর্‌লুম আমার বিপদে সে বেশ আনন্দ পাচ্ছে—এমনি করে একটা যুবককে বিব্রত দেখার হয়ত একটা সুখ আছে। চুপ করে থাক্‌তে পার্‌লুম না। বল্‌লুম, আমি এসে আপনার পিয়ানো বাজনাটা বন্ধ করে দিলুম। বলেই একটু লজ্জা হলো, হয়ত সে মনে ভাব্‌বে, আমি তাকে পিয়ানো বাজাতে বল্‌ছি। সে বল্লে, না, না, সন্ধ্যেটা dull বোধ হচ্ছিল তাই একটু বাজাচ্ছিলুম। তার মুখের দিকে চাইলুম—রংটা ফর্সা নয় কিন্তু একটা আশ্চর্য্য দীপ্তি আছে, তরবারির ইস্পাতের মত। মুখের দিকে চেয়েই আবার লজ্জা হলো, হয়ত সে ভাব্‌ছে, কি নির্লজ্জ ছেলেটা! চোখ দুটো তার মুখ থেকে তুলে দেওয়ালের দিকে চাইলুম—ছবি ভরা। ছবিগুলো দেখে একটা কথা কইবার জিনিষ খুঁজে বাঁচ্‌লুম। ছবিগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লুম, 'এ যে দেখ্‌ছি

অবণীবাবুর ছবি—ভারতীয় চিত্রকলা আমার বড়ই ভাল লাগে।
—হ্যাঁ, আমাদেরও বেশ লাগে—ঘরে সব ভাল আর্টিষ্টদেরই ছবি আছে। এই দেখুন না, নন্দবাবুর এই ছবিখানি—মা সেবার এনেছেন—তা ছাড়া বাবার অনেক ভাল পাথরের তামার পুরাতন দেবদেবীর মূর্ত্তির, ছবির collection আছে। আমি দেখ্‌লুম ঘরের চারিদিকে কালো সাদা পাথরের শিবমূর্ত্তি, শক্তি-মূর্ত্তি, সূর্য্যদেবমূর্ত্তি বেশ সুন্দর ভাবে সাজানো রয়েছে। চার কোণে টবের উপর ফুলগাছ সাজান। তা ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি, ফরাশী চিত্রশিল্পীদের আঁকা দুচারখানা নগ্ন ছবিও রয়েছে। একবার পাথর নড়ে গিয়ে কথার উৎস খুলে গেল। কুসানে বসে প্রতিভার সঙ্গে নানা রকমের কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলুম—ভারতীয় শিল্পকলার কথা, সাহিত্যের কথা, দেশ বিদেশের নব নব আন্দোলনের কথা। মন যেন কেমন খুলে গিয়েছিল তবু মনে হচ্ছিল ঠিক যেন কথাগুলো জোগাচ্ছে না, ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছি না। কিছুক্ষণ পরে অতুল এসে আমায় বাঁচালে। চা না খাইয়ে প্রতিভা ছাড়্‌লে না। অতুলের অনুরোধে পিয়ানোও শোনালে। আমার শুধু এইটুকু মনে জাগ্‌তে লাগ্‌লো—নারীর এ কি মঙ্গল শোভন নবরূপ দেখ্‌লুম। স্বাধীনতার মুক্তবাতাসে প্রাণ-শতদল বিকসিত হয়ে উঠেছে। কি আশ্চর্য্য পরিপাটির সঙ্গে ঘরগুলি সাজানো, কথা-বার্ত্তায় কি নিরাবিল স্বচ্ছতা, কি মাধুর্য্য! নূতন নারীর পরিচয়

নেবার জন্য প্রাণ উৎসুক হয়ে উঠেছে। মিসেস রায় যখন আমাকে মাঝে মাঝে যেতে বলেছেন, আর প্রতিভাও ত বলেছে ওখানে গেলে তারা খুবই খুসী হবে, তখন সেখানে যেতেই হবে।

আসবার সময় প্রতিভা বল্লে, আবার কবে আস্‌বেন?

--দেখি যা দূরে আপনাদের বাড়ী।

—আর একদিন আসবেন, মার সঙ্গে একটুও ত কথা হলো না।

তার বিদায়ের করুণোজ্জ্বল চাউনি যেন কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

আজ আবার নীলিমাকে ডাক্‌লুম। সঙ্কোচ অনেকটা ভেঙ্গেছে, নিজেই সহজে চেয়ারে এসে বসলো। বল্‌লুম, কি পড়ো? ভয় নেই, আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো না। একটু হাস্‌লে মন খুলে হাস্‌লেও বুঝি দোষ, জোরে হাস্‌বারও অধিকার নেই—চাপা চারিদিকে চাপা!

বল্‌লে, থার্ড ক্লাসে পড়ি।

—গান-বাজনা শিখেছ--ভয় নেই আমি গান গাইতে বল্‌বো না।

—না শিখিনি।

—কেন, ভাল লাগেনা।

—বৌদি দাদাকে বলে আমার জন্য গানের মাষ্টার ঠিক করেছিলেন, মা তাড়িয়ে দিলেন। বল্লেন,—মেয়েদের ঢং দেখে বাঁচি না, অতবড় মেয়ে এক পুরুষের কাছে বসে গান শিখবে, কেন থিয়াটারে নাচ্তে যাবে নাকি ?

৫

আজ সারা দিন কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া।

প্রথম ঝগড়া হলো শশাঙ্কবাবুর বিধবা পিসির সঙ্গে রাঁধুনির : রান্না ঘরের এক দিকে আঁস আর একদিকে নিরমিস—এখন আঁস ও নিরমিষ এই দুই হেঁসেল রাজ্যের সামান্ত রেখা নিয়ে যুদ্ধ লেগেছে। আঁস হেঁসেল থেকে একখানা তেজপাতা হাওয়ায় উড়ে নিরামিষ হেঁসেলের সামান্ত প্রদেশে এসে পড়েছে। পিসিমা একটু বেশি রকম সাত্বিক, গঙ্গাজল দিয়ে তাঁর রান্না হয়, সুতরাং তিনি গর্জ্জন করে উঠ্লেন। ওগো, বলি জাত-জন্ম কি আর রাখ্বে না ? বলি, তোমরাই না হয় খেরেস্তান হয়েছ, তা বলে কি বিধবা মানুষকে এক সঙ্গে এক হাঁড়িতে খেতে হবে ? হেঁসেলের হাঁড়ি সরা তিনি রান্নাঘর থেকে বার করে হন হন করে অবেলার স্নান করতে ছুটলেন। গিন্নি বলে উঠ্লেন, আদিক্ষেতা, সব আদিক্ষেতা। আঁস হেঁসেলের তেজপাতা কোথায় . ওঁর কড়া থেকেই উড়ে পড়েছে।

—হ্যাঁ গো, আদিক্ষেতা—কাল সারাদিন অমাবস্যার উপোস

'করে দুটো ভাতে ভাত চড়ালুম, তা তোমাদের আর সহ্য হলো না।

—পিসিমা এগুলো ডালচাল যে নষ্ট করলে—আজ-কালকার মাগ্যির বাজার—

—ঘাট হয়েছে মা—আমার ঘাট হয়েছে—সাতজন্মের পাপ করেছিলুম—গর গর করতে করতে তিনি কলে এলেন। সেখানে ঝির সঙ্গে আর এক ঝগড়া লাগ্‌লো।

—সকাল থেকে বাসন আর বাসন, বাসনের কাঁড়ি নিয়ে গেলি যে—সর লো এই

—ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এলে যে, দাঁড়াওনা বাপু—

তুই সারা সকাল কল জুড়ে বাসন নিয়ে বসে থাক্‌বি না কি ?

—বেশ থাক্‌ব, আমার যতক্ষণ না বাসন মাজা শেষ হয় থাক্‌ব—'

'ভাল বল্‌ছি সর, কল যেন ওঁর বাবার জমিদারী' ?

'তুমি বল্‌বার কে আমার বাবার জমিদারী ? তোমার বাবা কখন জন্মে কল দেখেছে ?'

'দেখ্, বাপ্ তুলবিনি বল্‌ছি'.

'কে আগে বাপ্ তুলেছে ?'

দুজনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। তখন গিন্নির গলা শোনা গেল. 'দূর করে দেব সব বাড়ী থেকে, দূর করব. একটু

ভয় ডর নেই—আ মোলো যা ! পিসিমা তুমিও যে কল দখল করতে এলে—হুরদয় না সব—হাঁকপাঁক করছে।'

—বিকেলবেলা পিসিমা ছাতে বসে সন্ধ্যা করছিলেন. এমন সময় বৌদির এক ছেলে তাঁকে ছুঁয়ে দিয়েছে। আর যায় কোথা। ছেলের পিঠে সজোরে এক কিল পড়ল, তারপর ছেলের কান্না ছাপিয়ে তাঁর চিৎকার উঠল, 'আমি মলে সব বাঁচে, এই সকালে দুবার চান করলুম. আবার সন্ধ্যাবেলা চান না করালে এদের হাড় জুড়াচ্ছিল না—বেশ এ ভরসন্ধ্যায় চান করি, নিউমোনিয়া হোক- সান্নিপাতিক হোক—আমিও বাঁচি তোরাও বাঁচিস্। আক্কেল দেখলি. ছেলেটা ছুঁয়ে দিলে,—বজ্জাত ঐ নীলি ছুঁড়ি ত শিখিয়ে দিলে।'

-"দেখ দিদি মা, আমি কি শিখিয়েছি ?"

—"হ্যাঁ, যা ঢং করিস্ না।"

"তা বলে তুমি ওকে মারলে কি বলে ? চার বছরের ছেলে ওকি বোঝে ?"—

"না, কিছু বোঝে না, তোমরা ওর মাথাটি বেশ ভাল করে খাও।"

তার পর পিসি মা, স্নান করে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে শুদ্ধ হতে গেলেন।

রাত্রে আবার হৈ চৈ। কোথা থেকে মাছ এয়েছে তার কয়েকটা মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। গিন্নি বলছেন "হ্যাঁরে,

কোথায় গেল মাছ—কোথায় লুকিয়েছিস্, শিগ্‌গির বের কর, বেটীদের সব পুলিসে দেব—কি ? বেড়ালে নিয়ে গেছে—আমায় কি কচি খুকি পেলি ?"

তার পর দেখি আমার ঘরের পাশে, যে ঝির সঙ্গে সকালে পিসিমা এত ঝগড়া করেছেন, তার সঙ্গেই চুপি চুপি কি মন্ত্রণা করছেন।

রাত্রে যখন নীলিমা ডাকতে এল, 'খাবেন আসুন' বল্‌লুম, 'আজ ব্যাপার কি ?'

ভারি গোলমাল, আপনার পড়্‌তে বড় অসুবিধা হচ্চে ?'

"না, না, মাছগুলি সত্যি গেল কোথায় ? তোমাদের বাড়ীতে জিনিস হারাণো একটা দস্তুর দেখছি।"

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, এই দেখুন, এই সেদিন দিদির বাড়ী থেকে কয়েক হাঁড়ি সন্দেশ এল, তার দুটো হাঁড়ি কেউ চোখে দেখতে পেলে না ! কি জানেন, দিদি মা—" বলেই সে অতি অপ্রস্তুত হয়ে মুখ রাঙ্গা করে চুপ করলে, আমিও লজ্জায় কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলুম না।

রাত্রির এই স্তব্ধ শান্ত তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে ভাব্‌চি, পৃথিবীর উপর যদি এই অনন্ত শান্তিলোক এই উদার নীলিমা যদি না থাকৃত, তবে মানুষের জীবন কি দুঃসহ হত। এই পিসিমাকে বিচার করতে চাই না, বুঝ্‌তে চাচ্ছি, বুঝতে কিছুতেই পারছি না। নিরপরাধ শিশুটিকে পিসিমা যেমন

মারলেন তার চেয়েও নিষ্ঠুরভাবে বুঝি সমাজ নিরপরাধিনীকে মেরেছে—তাঁহার সারাজীবন এমনি ভাবে উষ্ণ কথার উৎস বহিলেও তাঁর বুকে অতল তপ্ত অশ্রুজল বুঝি নিঃশেষিত হবে না।

এসব কথা ভাবতে আর ভাল লাগে না। ঘরের আলো নিবিয়ে দিতেই যখন চাঁদের আলো উজান বেয়ে এলো, কে আমায় বল্লে, ভুলিনি তোমায় ভুলিনি, এই আমার শাস্তি।

( ৬ )

বিকেলে এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিলো। পার্টিতে আমার এই প্রথম নিমন্ত্রণ। এটাতে যাবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার জীবনে কোনদিন ঘটেনি। ভেবেছিলুম ওদের পার্টিতে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে না, শোভনও হবে না। প্রতিভার কথাতে যাবার ইচ্ছা খুব না থাকলেও গেলুম। পরিচিতদের সঙ্গে পরিচিতাদের সঙ্গে প্রথম খানিকক্ষণ আমিও বেশ হেসে হেসে কথা কইতে পারলুম। বন্ধু অতুল তার মহিলা বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিসেস রায় এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। প্রতিভা ও কয়েকটি মেয়ে একটা গাছের তলায় খাবারের টেবিল ঘিরে চেয়ারে বসে গল্প করছিলেন আর তাঁদের ঘিরে কয়েকটি পশ্চিম হইতে সদ্য প্রত্যাগত যুবক। মিসেস্ রায় আমাকে তাঁদের দলে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমি হাসতে হাসতে প্রতিভার দিকে

অগ্রসর হলুম। আমাকে দেখে একজন দূরে থেকে বলে উঠলেন, "Hallo the moralist is advancing, let us guard our trench" সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা উঠলো। আমি কাছে যেতেই, একটি মহিলা তাঁর জাপানী ফ্যাসানে বাঁধা খোঁপাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে বল্‌লেন, প্রতিভা কিছু মনে করিস্ না ভাই, একটু মজা করি। তার পর জুতোর হিলের উপর ভর দিয়ে ঘুরে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, এই যে শ্রীপতি বাবু, এত দেরি হল—প্রতিভা ভাবছিলো আপনি বুঝি আর এলেন না, মটোর নিয়ে আমি আনতে যাবো ভাবছিলুম। আর একজন তাঁর গোলাপী সাড়ী দুলিয়ে বল্‌লেন, মিস্টার পাণিকারকে দেখে দূর থেকে ঠিক করতে পারিনি, মনে করলে আপনি, ছুটে যাচ্ছিলো। আমি দলে গিয়ে পড়াতে প্রতিভা যেন লজ্জিত হয়ে পড়লো, সে লজ্জা তার নিজের নয় তার বন্ধুদের জন্য। সেখান হতে চলে যেতে আমাকে যেন ইঙ্গিত করলে। আমি কিন্তু নড়্‌লুম না, তার মুখটা একটু কালো হয়ে গেল। নানা জনের নানা কথা কানে বাজতে লাগলো—

—ওরই বা এমন কি কপি রাইট আছে? হাঁ এতেও যদি দুঃখিত হন তা হলে Worldএ কোন কাজ করবার জো থাকে না।

—মানে ধর না এটুকু স্বাধীনতা যদি না দেওয়া যায় তা হলে Lifeএর মাঝখানে কি নিয়ে বড় হয়ে উঠবে।

—তুমি সেই French গানটা গাইতে পারতে, আজ একটু মেঘলা মেঘলা করেছে, mystic weatherটা আমার বড় ভালো লাগে. Londonএ প্রায়ই এমনি ধারা আকাশের অবস্থা।

—ওদিকে Lady Chakravarty এসেছেন, একবার ওদিকে যাওয়া যাক্।

—এই যে প্রতিভা, তোমায় ত আর দেখাই যায় না। মিস্টার স্মিথ্ তোমার কথা বলছিলেন, তোমার কত প্রশংসা করলেন। তাঁর Relief Fundএর জন্য আর কি করছি জিজ্ঞাসা করলেন।

—বেলজিয়ামে জার্ম্মাণ অত্যাচারের কয়েকখানা বই পড়ছি ভাই, কয়েক পাতা উলটোতেই চোখে জল এল। জ্যোতি চায়ের চিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, মুক্তি Bandage তৈরী করা আরও কি কাজে লেগেছে। মুক্তির সঙ্গে মিস্টার ঘোষের একটা engagement হয়ে ছিল না?

—না সে ছোকরা তো Insolvent বললেই হয়, তা ছাড়া তেমন কোন ভাল Education পায়নি।

কোট প্যাণ্ট পরিহিত প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক এক চায়ের টেবিল জমিয়ে বলছিলেন, দুর্ভিক্ষ হয়েছে বলে চাঁদা চেয়ে বেড়ান এক ফ্যাসান হয়েছে। আজ দুপুর বেলা আমার কাছে এক দল ছেলে এসেছিলো, হাতে একটা কাগজ, কতকগুলি irres-

pousible professor তাতে নাম দিয়েছে। Englishmanএ দেখলুম লোকগুলোর তেমন কষ্ট হয় নি। মিষ্টার বুল আমায় নিজে বলেছেন, কয়েকখানা গ্রামে একটু কষ্ট হয়েছে সে কিছুই নয়। কতকগুলো agitator কেবল চেঁচাচ্ছে আর ছেলেদের খেপাচ্ছে। আমি দু' চার কথা বলে ছেলেগুলোকে বিদায় করছিলুম, আমার স্ত্রী এসে পড়াতে কয়েকটা টাকা দিতে হলো।

—আহা, ওই টাকাটা আমাদের Relief Fundএ দিলেই হতো। এর মাঝখানে শুনলুম মিসেস্ মজুমদার আছেন, তিনিই এ কোয়াটারে আসতে বলেছেন।

—আসুন একটুখানি এ ধার ছেড়ে বেড়ান যাক্, Oh! they have said, they will say, let them say.

এ রকম নানা ধরণের কথা বার্ত্তার মাঝখান দিয়ে, একবার এর কাছে একবার ওর কাছে বসে মন কিন্তু কোথাও শান্তি পেলো না। আমি আসাতে প্রতিভা প্রথমে একটু গম্ভীর ছিলো তার পর কেমন দীপ্ত হয়ে উঠলো, যেন জানাতে চায় তোমার দেখাশুনা আমি গ্রাহ্য করিনা। কিন্তু আমি তাদের দল ছেড়ে চলে আসতেই দেখলুম সে আবার গম্ভীর হ'যে কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিভাকে দেখেছেন সে এত শিগ্‌গির চলে গেল নাকি।

পার্টির প্রতি জনের ছবিগুলি আজ নিস্তব্ধ রাত্রিতে একের পর এক আমার চোখের সামনে দাঁড়াচ্ছে। আকাশের তারাগুলো ফুটে রয়েছে, দু' চার টুকরো কাল মেঘ এক এক বার তাদের ঢেকে ফেল্‌ছে, আবার তারাগুলো হেসে নিশীথ ধরণীর দিকে দীপ্ত নয়নে চাইছে। এই কাল মেঘগুলির মত বিলাতী সভ্যতার বিকৃত ছবিগুলি—কিন্তু তার মাঝে মাঝে নারীর সহজ সরল মাধুর্য্য, অমল শক্তি তারার আলোর মত প্রাণের দীপ্তি জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। মিসেস্‌ মজুমদারকে দেখি নাই, তাঁকে বার বার প্রণাম করি। তিনি বাংলার মায়ের মত গরীব নিরন্ন ছেলেদের জন্য দ্বারে দ্বারে নিন্দা তিলক পরে হাত পেতেছেন। প্রতিভা বলে, তার নাকি এসব ভাল লাগে না; কি ভাল লাগে বলতে পারে না। তবে তাকেও সেদিন দেখলুম, সে নির্লজ্জ লীলায়, সে পুতুল নাচের মাঝখানে বেশ একটি চমৎকার অভিনয় করতে বাধল না।

( ৭ )

নালিমার কোন দিদি তাঁর ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসেছেন। তাঁর ঘরে দুর্ভিক্ষের চাঁদা আদায় করতে ইচ্ছে করেই গেলুম। দেশের মেয়েদের জানতে ভারি উৎসুক হয়ে উঠেছি। প্রণাম করে দিদির কাছে মেজেতে বসলুম। ভারি সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন, বুঝলুম অনধিকার প্রবেশ করেছি।

—দিদি, আমাদের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে আপনাকে কিছু সাহায্য দিতে হবে।

—কিসের দুর্ভিক্ষ ?

—খবরের কাগজে দেখেন নি ?

—না বাপু, আমরা আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর রাখি না—খবরের কাগজ পড়ি সময় কোথায় আর বিদ্যেই বা কি আছে বলো—

পাশে কয়েকখানা বাংলা নভেল পড়ে ছিলো, তাই উলটোতে উলটোতে বললুম, তা হলে দেশের খবর রাখাটা- -

দিদি কথাটা এড়িয়ে বললেন, উনি কাল পরশু আসবেন, ওঁকে বুঝিয়ে বোলো, যা হয় দেবেন। নীলিমার কাছে জেনেছি ইনি ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়ে ছিলেন, তার পর প্রথম সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে সব পড়াশুনা জলাঞ্জলি গেছে—এখন—বাক্সে বাংলা নভেল ?

হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস বয়ে সামনের গাছগুলো কাঁপিয়ে মর্ মর্ শব্দ হল—নীপের দল, কৃষ্ণচূড়ামঞ্জরী, নারিকেল পত্রপুঞ্জ দুলে উঠলো। আছো, মাগো পৃথিবী, তুমি বললে, আমি আছি বাছা। তোমার ঐ নব নব সৌন্দর্য্যবিকশিত মূর্ত্তি ভালবাসি বলেই এই পাষাণ কারায় বদ্ধ দন্দ্বপীড়িত সন্তানের কাছে তোমার সবুজ চিঠি পাঠালে।

( ৮ )

কাল বিকালে ভুলে বলে ফেলেছিলুম, নীলিমা চলো গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসি, বড় গরম।

আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো, তারপর হো হো করে হেসে ফেল্লে। তার প্রাণ খোলা হাসি শুনেও আনন্দ হোল।

সে গড়ের মাঠে? তাইত আমার খেয়ালই ছিলোনা, এ নীলিমাদের বাড়ী, প্রতিভাদের নয়।

রাতে এসে নীলিমা ডাকছিলো, খাবার দিয়েছে।

বল্লুম, কই ঘণ্টা বাজা শুন্‌লুম না ত?

অবাক হয়ে চেয়ে বল্লে, কি হয়েছে আপনার?

বাস্তবিক এত ভুল হচ্ছে কেন?

( ৯ )

কাল বিয়ে বাড়ী থেকে ফিরতে রাত হলো। সঙ্গী কাউকে পাবার আশা ছিল না। একা বিয়ে বাড়ীর লাল নীল ইলেক্‌ট্রিক আলো সাজান গেটটা পেরচ্ছি—পেছন থেকে কে ডাক্‌লে, চেয়ে দেখি প্রতিভা।

—খাওয়া হয়ে গেছে আপনার?

—হ্যাঁ বাড়ী যাচ্ছি।

—সঙ্গে কেউ আছেন?

—না একাই।

—ট্রাম পাবেন না নিশ্চয়ই।

—না এত রাতে আর ট্রাম কোথায়?

—আর এ পাড়াতে গাড়ীও পাবেন না—আসুন আমার সঙ্গে আমাদের গাড়ীই পৌঁছেদেবে।

কথাটা শুনে প্রথমে ইচ্ছে হলো বলি, দরকার নাই—কিন্তু তারপর ভাবলুম, লোকের কথাকেই সত্য বলে মানা হবে, সেটা নিতান্ত দুর্ব্বলতা এবং প্রতিভাও ভাবতে পারে আমার মনের গোপন অন্তঃপুরে বুঝিবা ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মত কোন কামনা জেগে আছে। তা ছাড়া এত রাতে ভরাপেটে এতখানি হেঁটে যেতেও মন সরছিল না। তবু চুপ করে রইলুম।

—চলুন, বড় রাত হয়ে যাচ্ছে, আকাশটা মেঘলা হয়ে আসছে বৃষ্টি আসবে। আমাকে সে একরকম টেনে গাড়ীতে তুললে—কথা কইতে মন যেন বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিলো—কিন্তু যেখানে দেখা হলেই কথাবার্ত্তা চলে সেখানে এত কাছাকাছি নীরব বসে থাকাও দায়। প্রতিভার মুখ দেখে মনে হলো সে আমার উপর বিরক্ত হয়েছে; ক্ষমা তার চাইবার কথা, না সেই দেখি আমায় ক্ষমা করতে চায়—যেন বলতে চায়, যা দেখলে তার মধ্যে কিছু মন্দ নাই, অন্যায় নাই। নীরবতাটা তার কাছেও অসহ্য হয়ে উঠল, ঝাঁঝাল সুরে সে কথা আরম্ভ করে দিল—

—আপনাকে মিস্ দাস ডাকলে তা বুঝি শুনতে পাননি?

—হাঁ শুনেছিলুম, তবে ইচ্ছা হলো না কথা কইতে, তাই চাই নি।

—কেন ? মিস্ দাস কি আপনার সঙ্গে কইবার যোগ্য নন ?

—তিনি যোগ্য হলেও—আমার যোগ্যতা ত থাকা চাই, অতটা শিক্ষা নাই যে ইংরাজীতে রসিকতা করি।

—দেখুন ডাক্তার—উত্তর না দেওয়াটা—

—ইচ্ছা হলো না flirt করতে, এর বেশী কি বল্‌বো।

—কি হয়েছে—একটু straightforward এতেই যত দোষ না ? চুপকরে মাথা হেট করে মেয়েরা চল্‌বে এই চান আপনারাও ?

—এ মোটেই নয়, straightforward একে বলে না—স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হবে, দেশের কাজে পুরুষ ও নারী একযোগে মিলবে—ফিরিঙ্গি মেয়েদের ভাব ও ঢং অনুকরণটা স্বাধীনতা নয়।

—বেশ, ফিরিঙ্গি মেয়েরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত, তাদের মত দেশের সব মেয়ে হতে পারলে দেশ উদ্ধার হয়ে যেত। কেন মিসেস মজুমদার, তিনিত এই শিক্ষা দীক্ষাই পেয়েছেন, তাঁর কাজ ত আপনি খুব প্রশংসা করেন।

—দেখুন, ভেবে দেখুন—আপনারা মোটেই ভাবতে চাননা—রেগে উঠবেন না—আপনাদের লেখা পড়া গান বাজনা বিয়ের আগে একটু একটু থাকে, তারপর সব শেষ—সাংসারিক

বই পড়তে দেখি বাজে বিলেতী নভেল আর magazine সত্যিকার জ্ঞানের পিপাসা চাই--

সে চুপ করে রইলো আমি চুপ করে থাক্‌তে পার্‌লুম না— বলে যেতে লাগলুম, দেখি সব শৌখীন চাষ—এই নভেল পড়া, ছবি আঁকা, গান গাওয়া—মেয়েরা কই নুতন আর্টের সৃষ্টি করছেন ? গান গান বটে কিন্তু নুতন নুতন সুর ও গানের সৃষ্টি কোথায়—পশ্চিমের নভেল-আবর্জ্জনায় আপনারা মজেছেন—বাংলার বীণাপাণি করুণ নয়নে আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন, আপনারা না হলে কে বিশ্বসাহিত্যমন্দিরে তাঁর মর্ম্মবাণী ঝঙ্কৃত করে তুল্‌বে—ভারতীর শতদলের আপনারা এক একটি পাঁপড়ি—

হঠাৎ সে বাধা দিয়ে বল্লে, হিন্দু সমাজের প্যান্‌পেনে মেয়েরা কি করছে বল্‌তে পারেন ? তার চেয়ে এরা অনেক ভালো —

-- ও আপনিও ওই দলের—

প্রতিভার মুখে চেয়ে দেখলুম, চোখে জল ভরে এসেছে, আর কোন কথা মুখে ফুটলোনা। কথা সহ্য করবার শক্তি নাই তবু কথা কেন তোলে বুঝ্‌তে পারি না। মনে মনে ভাবলুম কি দরকার ছিল এ সব কথা প্রতিভাকে বলবার ; তবু মনে হলো, যেন প্রতিভা এ সমস্তকে জানুক এর মধ্যে যা দোষ যা ত্রুটি আমার মতনই দেখ্‌তে পাক।

ধীর কণ্ঠে বল্লুম, খুব ঝগড়া করলুম আপনার সঙ্গে, আমার কেমন এ সব ভালো লাগে না:—হয়ত ঠিক বুঝি না ভুল বিচার করছি, মন খুলে সব বলে ফেলি—

—আমারও ভালো লাগে না দেখুন—

আরো কি বল্তে যাচ্ছিল, এমন সময় গাড়ী এসে তাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো, তা হলে কবে আস্ছেন, কাল ?

—না কাল হবে না।

আসবো বল্তে যেন কি বাধা বোধ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এদিকে কিছুদিন আর আসবো না।

গাড়ী রাস্তার নিস্তব্ধতা ভেঙে চল্তে লাগল—আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, তখনও মেঘ রয়েছে—রাস্তায় বৃষ্টি হয়ে মাঝে মাঝে জল জমেছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় আকাশের ভীষণ মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছিল—ভাব্তে লাগলুম ঐ বিয়ে বাড়ীর সাজ সজ্জা হাবভাব—আর তার মাঝে বর বধূর প্রেমের প্রদীপের আলো। প্রতিভা আমার কাছে তর্কে যাই বলুক, সে এসব চায় না। তার ভালো লাগা না লাগায় আমার কি ?—তবু মনে ব্যথা লাগে।

( ১০ )

আজ নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে গেলুম। এমন পরিষ্কার এমন গোছাল ত আমি কোনদিন ছিলুম না। টেবিলে বই খাতা কাগজ পেন্সিল টুথব্রাস দেশলাই ছবি একে-

রারে ছড়ান থাকে—আলনায় গামছার ওপর গেঞ্জি কোটের ওপর কাপড়, এমনি ভাবেই চিরকাল চলে এসেছে। আজ দেখি ঘরখানিকে কে নিখুঁত করে সাজিয়ে রেখেছে। আজ নয়, রোজই সন্ধ্যাবেলায় এসে দেখি ঘরখানি বেশ সাজান—আবার যে কে সেই হয়।

নীলিমা দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে বললুম; দেখ আমার ঘর অত যত্ন করে গুছিয়ে যাও কেন, ও পণ্ডশ্রম।

—কই, আমিত আপনার ঘর কোনদিন গুছোতে আসিনি।

—কি ? তবে ভূতে সাজিয়ে যায় নাকি ?

—তা বলতে পারি না তবে বৌদিকে মাঝে মাঝে যেতে দেখি—আচ্ছা জিজ্ঞেস করে আসছি।

আমিও মাঝে মাঝে অবাক হয়েছি, সকালে যে গেঞ্জি তোয়ালে ময়লা রেখে গেছি, বিকেলে এসে দেখি ধব্ ধবে্ শাদা সাজান রয়েছে।

ওঃ, কালো মেয়ের বুকে বিদ্যুতের ঝিলকির মত হঠাৎ চমকে উঠলো—হ্যাঁ বৌদিদিই ত। এখন মনে পড়ছে, রোজ নীলিমা এসে জিজ্ঞেস করেছে, বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কি খাবেন, বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন, বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, ফিরতে রাত হবে কি ?

রোজ রোজ বৌদি কত তথ্যাই না নিয়ে কত যত্ন করেছেন, তা খেয়ালই করি নি। সেদিন নীলিমা যখন দশটাকার একখানি

নোট নিয়ে এসে বল্লে, বৌদি এটা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে দিলেন, কিন্তু বাড়ীর কাউকে এটা বলবেন না, এর মধ্যে কি আশ্চর্য্যকর জিনিষ আছে তা মনেই হয় নি।

আজ সন্ধ্যাবেলা ঘরটির দিকে চেয়ে কি পরম তৃপ্তি পেলুম। এ ঘর কেবল ইট সুরকি বালি দিয়ে গড়া, রৌদ্র বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম হতে রক্ষা পাবার আশ্রয় নয়—এ এক স্নেহের কোল। মানুষের ত অনেক আশ্রয় আছে, হোটেলের ঘর, মেসের ঘর—তারা মানুষকে রক্ষা করে, কিন্তু এ আনন্দ শান্তি তারা কোথায় পাবে? এ যে এক নারীর স্নেহের হাতের স্পর্শে মধুর, যত্নের আদরে স্নিগ্ধ, প্রেমের উৎকণ্ঠায় পবিত্র। বৌদিদি, তোমার চরণের সত্যিকার ধুলো আমার ভাগ্যে ঘটবে না, বার বার তোমাকে আমি প্রণাম করি।

( ১১ )

আজ সারা দুপুর নীলিমাকে ডেকে বৌদির গল্প করেছি। বৌদির কথা বল্‌তে তারও ভারি আনন্দ দেখ্‌লুম। সমস্ত সংসার তিনিই চালান, ভোর হতে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত অবিশ্রাম খাটুনি। ইঞ্জিনের ফোঁস ফোঁসের মত গিন্নি সারাদিন গর্জ্জন করেন বটে, কিন্তু আসল ষ্টীমপাওয়ার ওই অবগুণ্ঠনবতী নির্ব্বাক্ মঙ্গল কর্ম্মরতা একুশ বছরের মেয়েটি। শ্বশুর স্বামী ছোট ছেলে মেয়ে হতে বাড়ীর ঝি চাকর আর এই অভাগা অতিথিটি—প্রত্যেকের প্রতি তাঁর গভীর মমতাপূর্ণ সজাগ দৃষ্টি আছে—

কে কি খাবে, কার খাওয়া হল না, কার কি কাপড় জামা চাই।

সাম্‌নের নারকেল গাছটার পত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে আছি, বৌদির ঘর হতে জান্‌লা দিয়ে আলো এসে পাতাগুলোর উপর ঝক্ ঝক্ করছে—এখন বৌদি কোন বই কি খবরের কাগজ নিয়ে পড়্‌তে বসেছেন।

বৌদি আমায় বাঁচালেন। সমস্ত মন জুড়ে যে নারীর প্রতি বিরক্তির কালো মেঘ ভরে এসেছিলো সে মেঘ কাটিয়ে হীরেগলানো চাঁদের মত তাঁর স্নিগ্ধ পবিত্র আলো চারিদিক উজ্জ্বল করে তুল্‌লো।

( ১২ )

নীলিমার সঙ্গে বেশ ভাব হচ্ছে। এখন সে বেশ সহজেই চেয়ারে বসে গল্প জুড়ে দেয়, সরল মনে যা ভাবে বলে যায়। আমার ঘরে এসে ও কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পায়। কিন্তু কাল সে কেন একবারও আসেনি ভাবছি, এমন সময় গিন্নির গলা শুন্‌লুম, কি গো মেম সাহেব একেবারে ধিঙ্গি হয়ে উঠ্‌লে যে, না, না—আর পান্ সাজতে হবে না, তোমরা চেয়ারে বসে গল্প করবে, গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবে, বড় বড় বই পড়ে বক্তৃতা দেবে—এ সব ঝিদের কাজ।"

যে Personalityর বালাই নিয়ে প্রতিভা মুস্কিলে পড়েছে, সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাত হতে নীলিমা বেঁচেছে। এ নিজে

চল্‌তে পারে না, তবে ঠেলা দিয়ে যে পথে চালাও, যাবে। জুতো পর্‌তে চেয়ারে বস্‌তে বেড়াতে যেতে এর প্রথম বাঁধবে বটে কিন্তু কিছুদিন অভ্যস্ত হলেই দুরস্ত হয়ে যাবে। আবার পিসিমার মত গঙ্গাজল দিয়ে রান্না কর্‌তে গোবর জল ছড়া দিতে আহ্নিক কর্‌তে শেখালেও কিছুদিন পরে পিসিমাকেও হার মানাতে পারে। আপন মনে গুম্‌রে মর্‌তে পারে কিন্তু কখনও বিদ্রোহ কর্‌বে না।

এর মাঝে সজীব স্বাধীন সতেজ মনটাকে কি জাগানো যায় না—সেত কেবল ঘোমটা খোলানো, জুতো পরানো, চেয়ারে বসানো নয়।

( ১৩ )

অনেক দিন পরে প্রতিভাদের বাড়ী কাল গেলুম। প্রতিভার ঘরে বসে বসে ভাবছিলুম, কত দিন আসি নি, হঠাৎ ঘরে দেখে একটু আশ্চর্য্য হবে, হয় ত একটু অভিমানও করবে—আসি নি কেন তার এমন কিছু কারণ দেখাতে পার্‌বো না, মিথ্যা বলি না এ কথা কেমন করে বল্‌বো তবু প্রতিভার কাছে মিথ্যা বল্‌তে মন সরে না।

—বেয়ারা, মিস্ বাবা কাঁহা গিয়া ?

—হুজুর, অভি আয়গা—আপ বৈঠিয়ে।

বসে বসে তার টেবিলের উপর বইগুলি নাড়্‌ছিলুম। দেখলুম, অনেক ইংরাজী বই সরেছে তার জায়গায় সংস্কৃত

বাংলা বই এসেছে ; কাশীরামদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণও রয়েছে। ভীষ্মপর্ব্বে একটা কাগজ দেওয়া রয়েছে, একদিন একটি মেয়ে বলেছিলেন, Sreekrishna that cow-herd boy, সে কথা শুনে আমি দুঃখ করেছিলুম—দেখ্‌লুম সে দুঃখের ফল ফলেছে। প্রতিভার ঘরের পাশ থেকেই কার গলা শুনতে পাওয়া গেল। তার বাবা মা কথাবার্ত্তা কইছেন।

—শ্রীপতি ছেলেটি ভাল তবে যা কতকগুলো idiosyncrasy আছে।

—ওগুলো না ছাড়্‌লে সমাজে চল্‌তে পার্‌বে না।

—ওগুলো বিলেত গিয়ে থাক্‌লেই ঠিক হয়ে যাবে।

—কিন্তু ও ত কিছু বল্‌তে চায় না—প্রতিভার সঙ্গে অনেক দিন মিশ্‌ছে, সেদিন এক সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলো।

—আমি ত সব সময় বাড়ী থাকি না, প্রতিভাকে দেখে তুমি কিছু বুঝ্‌তে পারো না ?

—না, সে যেন দেখি একটু বদ্‌লে গেছে, আগে পার্টিতে যেত পিক্‌নিকে যেতে কত আমোদ পেত, এখন দেখি সকলের সঙ্গে মিল্‌তে মিশ্‌তে মোটেই ভাল বাসে না—টেনিসক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, বাড়ীতে জুতো পরে না, রান্না ঘরে গিয়ে মাটিতে বসে হেঙ্গাম লাগিয়ে দেয়।

—তা হলে দেখ্‌ছি শ্রীপতির influnce ওর মধ্যে বড্ড কাজ করেছে—তা শ্রীপতি যদি ওকে life-partner করে তা

হলে আমার কিছু বল্‌বার নেই, তা নইলে শুধু যদি irres-ponsible এর মত মিশতে চায়, ফুর্ত্তি কর্‌তে চায়—

কথাগুলো শেষ না হতেই আমার আর সেখানে এক মুহূর্ত্ত বসে থাকতে ইচ্ছা হোলো না। টল্‌তে টল্‌তে যেন অতি কষ্টে প্রতিভার ঘর থেকে বাহিরে এলুম। গেট পর্য্যন্ত যেতে যেন কতক্ষণ সময় লাগ্‌ছিলো। রাস্তায় খুব শীঘ্র চলে আস্‌ছিলুম, এমন সময় দেখি প্রতিভা তাড়াতাড়ি আমার দিকে আস্‌ছে। একটু স্মিতহাস্যে আনন্দ জানিয়ে আমাকে তাদের বাড়ীর দিকে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে এলো। মনের মধ্যে ঝড় চেপে হাসি মুখে বললুম, আজ যাব না বেলা হয়ে গেছে, পশু দেশে যাচ্ছি, ছুটি হলো,—তাই দেখা কর্‌তে এসেছিলুম'।

আমার মুখের দিকে চেয়েই সে যেন সব বুঝে গেল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে, আসুন।

ধীরে আমরা দুজনে তাদের বাড়ীর পাশে এক বড় গাছের তলায় গিয়ে বস্‌লুম। মাথার উপর মেঘঘন আকাশ কাজল মাখা চোখের মত নিবিড় হয়ে এল, গাছের পাতা নাচিয়ে ঝড় উঠ্‌ল—বড় বড় ফোটায় জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। সেই ঝড়ে গাছের ছায়ায় প্রতিভা তার মুখখানি আমার মুখের কাছে এনেই বল্‌তে লাগ্‌লো,—এই যে চলে যাচ্ছিলেন আমায় না বলে।

ভোরের বাতাস লেগে যেমন শিউলি ফুল ঝর ঝর করে পড়ে যায় তেমনি তার করুণ কথার বাতাস লেগে প্রাণের

সকল ব্যথা সকল কথা এক মুহূর্ত্তে ঝরে পড়্লো—দেখ প্রতিভা তোমার সঙ্গে না দেখা করে আমার যাবার উপায় ছিল না—তোমার মধ্যে আমি দেখ্তে চেয়েছি, শুধু নারী বন্ধুকে নয়, শুধু নারীর নিষ্কলঙ্ক দীপ্ত স্বাধীনতা নয়—তোমার মধ্যে আমি দেখ্তে এসেছিলুম বাংলার নতুন নারীকে—বাংলা মায়ের স্নেহের মত বাংলার বোনের ভালবাসার মত বাংলার সব পুরাণ মিঠে ভাবে ভরা রয়েছে—আর তার সঙ্গে রয়েছে পশ্চিমের প্রবল স্পর্শ, স্বাধীনতার সতেজ বিকাশ। তোমাকে বন্ধুর মত দেখ্তে চাই বন্ধুর মত পেতে চাই।

সে আমার দিকে তাকালো সে চাউনি জীবনে ভুল্বোনা। ব্যথিত স্বরে বল্তে লাগলুম, 'তবু তোমার জীবন দেখে বড় বেদনা বোধ হয়, স্বদেশের নিরর্থক আচার কুপ্রথার জালে জীবন জড়ায়নি বটে কিন্তু নূতন জঞ্জাল এসে জম্ছে যে—আজ তুমি সত্যি বল, আমি জেনে যেতে চাই যা পেয়েছো তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছো এই জীবনে কি আনন্দ পেয়েছো—তোমার মুখের বাণী দিয়ে মর্ম্মের কথা শুনে যেতে চাই।

অশ্রুভরা কণ্ঠে প্রতিভা বল্তে লাগ্লো, দেখুন ছেলেবেলা থেকে যা চারিদিকে দেখেছি শুনেছি তাই নিয়ে গড়ে উঠেছি। দেশের সঙ্গে সত্যিকার প্রাণের পরিচয় হয়নি—দেশের প্রকৃতির সঙ্গে কোন সত্যিকার যোগ হয়নি। ছুটিতে বেড়াতে গেছি—সিমলা, দার্জ্জিলিং, শিলং,—বাংলামায়ের শান্ত-

স্নিগ্ধ পল্লীরূপ কোন দিন দেখ্‌লুম না। যে স্কুলে পড়েছি তা মেমেদের, সেখানে যা লাভ করেছি, তা আমাদের নয়—সেখানে থেকে শিখেছি, কেমন ভাবে ইংরাজি লিখ্‌তে পড়্‌তে হয়, ইংরাজি গান গাইতে হয়, কেমন ভাবে সমস্ত লোকের সঙ্গে মিল্‌তে মিশ্‌তে হয়, সাজ সজ্জা করে পরিষ্কার থাক্‌তে হয়। বাইরে যখন বসন্তকাল, ফুলে বাগান ছেয়ে গেছে, পাখীর ডাকে বারে বারে বাইরে মন ছুটে যেতে চায়, তখন মেমের কাছে ফ্রেঞ্চ শিখেছি পিয়ানো বাজিয়েছি হাতের আঙ্গুল গুলি ব্যথায় অস্থির হয়ে গেছে—পাখীর ডাক উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছে তবু সেই Lessonএর পর Lesson। তার পর যা কিছু করেছি তা সমাজের গরজের জন্য, প্রাণের গরজ কোথায় কি করে মেটাতে হয় তাত জানি না। মনটাকে চির দিন বুঝিয়ে এসেছি, বেশ আছি! বেশ আছি—এই অশান্ত বিদ্রোহী মনটাকে কেবল সমাজের প্রশংসার আফিং খাইয়ে বার বার ঘুম পাড়াতে চেয়েছি—কিন্তু আর সে চুপ করে থাক্‌তে চায় না—ভাল লাগে না এসব—

এসব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ভারি আনন্দ বোধ হচ্ছিল—আমিইত তাঁর জীবনকে চঞ্চল করে তুলেছি। তিমিরান্ধ আকাশ বিদ্যুৎবিদীর্ণ হয়ে উঠ্‌লো, গাছের পাতা থেকে দু'জনের গায়ে জল ঝরে পড়ছিলো সেদিকে আমাদের লক্ষ্যই ছিল না।

দীপ্তচক্ষে জিজ্ঞাসুর মত চেয়ে সে বল্‌লে, আচ্ছা মানুষ সমাজকে সৃষ্টি করেছে—না সমাজ মানুষকে সৃষ্টি করেছে—ব্যক্তির জন্য সমাজ না সমাজের জন্য ব্যক্তি, সমাজের নিয়ম মানুষকে গড়বার জন্য না বাঁধবার জন্য ?

মুগ্ধনেত্রে তার দিকে চেয়ে বললুম দেখ জীবনে যখন প্রশ্ন জেগেছে জীবনের সাধনা দিয়ে তার উত্তর খুঁজতে হবে। বাইরে থেকে কেউ সমস্যার সমাধান করে উত্তর দিতে পারে না—কিন্তু জেনো মানুষ সমাজের বাধা নিয়ম পালন করতে জন্মায়নি। সমাজের নিয়ম তার এগিয়ে চলার পথ মাত্র, সে পথ তার পূর্ব্বপুরুষেরা তাদের সুবিধা মত গড়ে গেছে, সে পথ সে আপন প্রাণের আনন্দে যেমন খুসি ভেঙ্গে গড়ে চল্‌তে পারে। নিয়ম মানাটাই বড় নয়, আপনাকে বিকশিত করে তোলাই বড় জিনিষ।

আমার মুখের দিকে আবার সে চাইলো—সে চোখের চাউনিতে মনে হলো সে যেন বল্‌তে চায়, আমার এ আগে চলার পথে তুমি সাথী হবে না ?—আমি একা কেমন করে সমাজের সঙ্গে যুঝে যুঝে নতুন পথ গড়্‌তে গড়্‌তে যাবো ?

সে ধীরে মৃদু হেসে বল্লে, বাবা মার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেছে জানেন, খালের ধারে Slumগুলো দেখতে গিয়েছিলুম্—এক ডাক্তার বন্ধু নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি,—

আমি কিছু উত্তর দিলুম না, তার হাতটি আমার হাতে টেনে

নিলুম, অন্তর জয়ধ্বনি করে উঠ্‌লো—বিদ্রোহিনী তোমাকে নমস্কার, নারীর নবশক্তির দিব্যরূপ দেখে আমি সার্থক হলুম! সার্থক হলুম।

( ১৪ )

গাঁয়ে ফিরে এসেছি। ভাঙা পোড়ো বাড়ীর মত এই দারিদ্র্য ক্লিষ্ট ম্যালেরিয়াজীর্ণ গ্রাম, তবু এখানে এসে মনে হয় এ দুঃখিনী মায়ের স্নেহের আঁচল—সে মায়ের এক চোখে সন্তানের নিদারুণ দুঃখে অশ্রুজল, আর এক চোখে সন্তানকে বুকে পাওয়ার আনন্দাশ্রু। শরতের নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ থেকে রূপালি জ্যোৎস্না চারিদিকে ঝরে পড়্‌ছে। চাঁদের আলো ঐ পাঁকে ভরা পানাপুকুরের জলে গলান হীরের মত ঝক্‌ ঝক্‌ করছে—কাশের বনে সুধার বাণ ডেকে এসেছে—সুবাস বাতাস এসে পাড়ের ঘাসগুলো দুলোচ্ছে। জ্যোস্নার ঝিকিমিকি ভরা জলে যেখানে বাঁশ পাতা নারকেল পাতাগুলো কাঁপ্‌ছে সেই আলোছায়ার মায়ালোকের দিকে চেয়ে বসে আছি—

একখানি মুখ ভেসে উঠ্‌ছে—অতি সরলা সুকুমারী এক কিশোরীর মুখ—স্নিগ্ধতা স্নেহসেবায় ভরা। সে মুখ মিলিয়ে আর একখানি মুখ ভেসে উঠ্‌লো—প্রেমদীপ্ত তেজে উজ্জ্বল বেদনায় আকুল।

একজন শরতের নির্ম্মল শেফালি, আর একজন কাঁটাভরা গোলাপগাছের রক্তরাঙ্গা ফুল—একজন বাংলার ছোট পল্লীনদী

গ্রামের বধূর মত তার দুই তটের কয়েকখানি ছোট গ্রাম নির্ম্মল করে, নিঃশব্দে নির্জ্জনে মঙ্গল কাজ করে, বাঁশঝাড়ের অবগুণ্ঠনে কোথায় সে লুকিয়ে পড়ে, পল্লীবালার কাঁকণেরই মতন তার মৃদু কলধ্বনি—আর একজন চঞ্চলা কলমুখরা গিরিনদী—বিশ্ব সমুদ্রের ডাক তাকে উতলা করে তুলেছে—বাঁকা পথের শান্তিকে চায় না, প্রাণের বেগে নব দেশ সৃষ্টি করে যেতে চায়।

উত্তর দিকে কয়েকখানি বিদ্যুৎগর্ভ কালো মেঘ জমেছে—জ্যোৎস্না রাত্রি বিদ্যুৎবিদীর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে।

কি চাই ? নারীর নবরূপ দেখতে চাই—তার এক চোখে জ্যোৎস্না, আর এক চোখে বিদ্যুৎ, তার এক হাতে ফুলের মালা, আর এক হাতে খড়গ, বক্ষে তার বীণা বাজ্‌ছে—মুখে অভয় হাসি ঝর্‌ছে—এক চরণে নূপুর ধ্বনি, আর এক চরণে বজ্র—প্রাণের সে বন্ধু, পথের সে সাথী, শ্রান্তির সে শান্তিক্রোড়, নব নব বন্ধনলীলায় নব নব মুক্তি, অনন্তপথ চলায় ঐ সুদূর দিগন্ত প্রান্তে দিগদর্শন মঙ্গলপ্রদীপের অনির্ব্বাণ আলোক শিখা।

আবার দু খানি মুখ পাশাপাশি ভেসে উঠ্‌ছে।

## জয়মালা।

প্রতিভা চলন্ত রেলগাড়ীর জানালার ধারে বসে দেখ্‌ছিল, যে দিক্‌টা সে ছেড়ে এসেছে যেন দুধারের গাছপালা সেই দিকেই ছুটে চলেছে। নীচের দিকে মুখ করে দেখ্‌ল জলের ডোবা, কাঁটার কুঞ্জ, শীর্ণপথের রেখাগুলি পেছনের দিকেই ধেয়ে চলেছে। তাকে নিয়ে চলেছে রেলের গাড়ী!

তার স্বামী অজিত ছেলেদের সঙ্গে গল্প করছিল। প্রতিভা মাথাটা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে যেন বুদ্ধি সঞ্চয় করে নিল। স্বামীর দিকে চেয়ে ডেকে বল্‌ল, দেখ বিলেতের লোকেরা নাকি আকাশ দেখ্‌তে পায় না?

অজিত হেসে উত্তর কর্‌ল, হাঁ, খানিকটা তাই বটে। ধোঁয়াতে সহর ছেয়ে থাকে সত্যিকারের আকাশ বড় একটা দেখা যায় না। আর তা ছাড়া সবাই এত ব্যস্ত যে তারা বড় আকাশ দেখ্‌তে চায়ও না। তবে যার নেহাৎ না দেখ্‌লে নয় তাকে বোধ হয় সহর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।

প্রতিভা একটু হেসে বল্‌ল—তাইত, বরাদ্দের বাইরে কিছু পেতে হলে তাদেরও বেরিয়ে যেতে হয়!

প্রতিভার চোখের ওপর সন্ধ্যার আকাশের নীল জ্যোতিখানি এসে যেন ছায়ার মত পড়েছে। বড় বড় চোখ দুটি ভরে

একবার অজিতের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল—আচ্ছা বল্‌তে পার, আমরা যদি মরে যাই তবে আমাদের এই সন্তানদের জন্য দায়ী কে ?

অজিত কথাটা শুনে বিজ্ঞের মত উত্তর কর্‌ল—যাঁর ইচ্ছায় এরা এসেছে তাঁরই দায়িত্ব। যিনি আমাদের দুজনকে সন্তানের প্রতিপালক করে পাঠিয়েছেন, আমাদের অবর্ত্তমানে তাঁরই এদের জন্য দায়িত্ব।

প্রতিভা উত্তরটা শুনে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। কথা বল্‌তে গিয়ে তার চোখের কাণায় কাণায় জলে ভরে উঠ্‌ল। অজিত বুঝ্‌ল প্রতিভার এখুনি কোনও কথা বলা সম্ভব হবে না। তাই তার হাতখানি হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল—প্রতিভা আজ হঠাৎ এ কথাটা নিয়ে এত অস্থির হয়েছ কেন ? সত্যিই কি এদের সকল ভার তাঁর ওপরে নয় ?

প্রতিভা নতচক্ষু তুলে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে উত্তর কর্‌ল, আজ দরকার হয়েছে তাই এ কথাটা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়েছি। এতদিন আমার নিজের কোনই খোঁজ করি নি। তুমি বল্‌লে তাঁর ইচ্ছায় এরা এসেছে। না, তা কেন ? দাতা দিয়েছেন এই মাত্র। দায়ী কি আমরাই নই ?

অজিত প্রতিভার কথা শুনে সহানুভূতির স্বরেই বল্‌ল—তাত বটেই, তবে আমাদের কি কোনও হাত আছে ? আমরা যে নেহাৎ অক্ষম।

প্রতিভা বাধা দিয়ে বল্‌ল—না তাই কি? তুমি যখন আমাকে স্ত্রীরূপে চেয়েছিলে তখন অন্য আর কোনও কথা ভেবেছিলে কি? ভেবেছিলে কি এত বড় একটা পৃথিবীতে আমারও কিছু করবার থাক্‌তে পারে? আমারও কিছু পাওয়ার সাধ থাক্‌তে পারে? তা ভাব নি। তার জন্য সবুর করনি। তুমি চেয়েছিলে আমাকে—শুধু আমাকে পেয়ে তোমার সব শেষ হয়ে গেছে। তার পরের যা কিছু তা মায়ের বুকের রক্ত কমল হয়ে ফুটে উঠেছে।

অজিত এবার রাগ করেই বল্‌ল—তবে কি তুমি এ পথ থেকে ফিরে যেতে চাও?

প্রতিভা বুঝ্‌ল তার কথাগুলি বুঝ্‌তে না পেরেই অজিত এমন চটে উঠেছে। আরও ভাব্‌ল—তার প্রাণের ঐ ভাষা বুঝ্‌তে হলে তেমনি আরেকখানি গোপন প্রাণের দীনতা চাই। তাই নম্র স্নেহের সুরে বল্‌ল—তা কেন? আমার সহিষ্ণুতা মমতার কি কখনও অভাব দেখেছ? জীবন আরম্ভ করেছি, আমার সকল বেদনার আবেষ্টনে তোমার সংসার সুখের করে তুল্‌ব। তুমি আমাকে কখনও বুঝ্‌তে চাওনি সে এক রকম ছিল। আজ কেন বুঝতে গিয়ে ভুল বুঝ্‌ছ?

অজিত প্রতিভার মুখখানি দুহাতে ধরে একেবারে তার চোখের সাম্‌নে নিয়ে এল।

প্রতিভা হেসে বল্‌ল—কি দেখ্‌ছ? এত কাছে এনেও কি সব দেখতে পাওয়া যায়?

অজিত আদর করে বল্‌ল—প্রতিভা, সত্যি তোমার প্রতিভার কোন ঠাঁই দিই নি আমি। তাই বুঝি এতখানি তোমাকে পেয়েও আমি মাঝে মাঝে ভাবি তোমাকে একটুও পাই নি। তাই ভুল বুঝিয়ে মনকে ফাঁকিই দিয়ে এসেছি। জান্‌তাম না তোমার জীবনকে এমন করে আমি নষ্ট করেছি। সত্যি বুঝি নষ্ট করেছি। কিন্তু বল্‌বে আমায় যা তোমার পাওয়ার আশা ছিল তা কোথাও পেয়েছ?

প্রতিভা কেবল একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধর্‌ল, তারপর হেসে উত্তর করল—যদি পেয়েই থাকি। আমি প্রাণ ভরে সে পাওয়াকে দূরে রেখে ভোগ কর্‌ছি। আমি যে মা—

অজিত ছাড়বে না। সে ভাব্‌ল প্রতিভা তার স্ত্রী, তার দুঃখের কথা তাকে জেনে নিতে হবে। সে জ্ঞানের পূর্ণপ্লাবনে বুঝি তার হৃদয় ভরে উঠ্‌লো, তারই গৌরবে খুব উত্তেজিত হয়ে বল্‌ল—প্রতিভা, তোমার ঐ হাসি বুঝি চোখের জলের চাইতেও করুণ। আমাকে বল্‌বে না তোমার দুঃখের কথা?

প্রতিভা শান্তভাবে অজিতের হাত দুখানি নিজের বুকের কাছে তুলে নিয়ে বল্‌ল—মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট থাকে সত্য। তাই সে যতখানি পারে মানুষকে তার ভাগ দেয়। আমিও তোমাকে অনেক দুঃখের ভাগ দিয়েছি। কিন্তু সত্যি-

কারের একটা দুঃখই মানুষের থাকে সেটার ভাগ সে কারুকে দিতে পারে না। স্বামী স্ত্রীকে নয়—স্ত্রী স্বামীকে নয়। মানুষ সব দেয় জগতে শুধু ঐটুকু নিজের ব'লে রাখে। তাতে কারুর হাত দেবার অধিকার নাই—বুঝি দেবতারও নয়।

অজিত স্তম্ভিত হয়ে বল্‌ল—দেবতারও নয়! প্রতিভা খুব সহজ ভাবে উত্তর করল—না। দেবতারও নয়। সে যে তার নিজের ওপর নিজের নিষ্ঠুরতা। কোন্ লজ্জায় সে দেবতার কাছে তার শাস্তি চাইবে?

অজিত ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল—বুঝতে পারছি না। তার পর প্রতিভার হাতের এক গাছি চুড়িতে হাত দিয়েই অজিত হাত সরিয়ে আন্‌ল।

প্রতিভা তা লক্ষ্য করে বল্‌ল—কি হোল? আমার কথায় কি তোমার মনে হয় আমি সন্তানদের ভাল বাসি না? বল তোমার কি মনে হয়েছে। যা বুঝ্‌তে পারছ না তা' হয়ত তা হলে বুঝিয়ে দিতে পারব।

অজিত সুযোগ পেয়ে বল্‌ল—হাঁ, তাই যদি মনে হয়ে থাকে। তোমার আজকের এই সব কথা যে কেউ শুনত তারই ঐ কথা মনে হোত।

প্রতিভা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। তার গলার স্বর বেরুতে চাইল না। একটু পরে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল—হাঁ তা তারা মনে করত আমি তা স্বীকার করি। তারা যে বেশীর

ভাগ তোমারই মত। বন্ধু বলে ক'জন মানুষ স্ত্রীকে চেয়েছে যে তারা স্ত্রীর মনের কথা বুঝ্‌বে? স্ত্রীর মুখের কথায় তার মনের ব্যথা বুঝ্‌বে? তাই তুমিও বুঝ্‌তে পারনি আমার কথা। খুলেই বল্‌ছি শোন। তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে আমাকে দেখে তোমার ভাল লেগেছিল বলে। তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে ব'লে। তুমি নিশিদিন আমার কাণের কাছে গান গেয়েছ—তুমি আমাকে ভালবাস। সেটা বুঝি তোমার নিজেকে ভালবাস্‌তে বলেই আমাকে ভালবাস্‌তে। বিয়ের আগে কখনও বন্ধুরূপে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াও নি। একদিনও জান্‌তে চাও নি, আমারও কিছু বল্‌বার আছে কি না। আমার বেশ মনে আছে—যদিও বা কখন কিছু জিজ্ঞেস কর্‌তে—সেটা যেন তোমারই মনের সম্পদ বাড়াবার জন্য। জিজ্ঞেস কর্‌তে—আমি তোমাকে নিয়ে সুখী হ'তে পার্‌ব কি না। তোমাকে যদি ভাল নাও বাসি তবু তোমার ভালবাসা নিয়ে তৃপ্ত হব কি না। এ সকলই তোমার জন্য তুমি কর্‌তে। যেন আমি তোমার স্ত্রী হবই এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তবুও আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই বলেছিলাম—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি ছাড়লে না। সবই ত হয়ে গেল। আমার ভালবাসা পাওয়ার অপেক্ষায় তোমার কিছুই ঠেকে রইল? আমাদের মানুষরা আমাদের দেখে মনে কর্‌ছে আমরা তাদের আদর্শের মতই সংসার ধর্ম্ম করে চলেছি। আর বুঝি চলেছিও।

অজিত এবার একটু নরম হয়ে গেল। প্রতিভার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল একটা দারুণ হাহাকার যেন তার চক্ষের কারায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। বিশাল তার চোখ দুটীতে একটা মস্তবড় আবেদন যেন বিশ্বের দিকে চেয়ে রয়েছে। প্রতিভার চোখ জলে ভরে গেল। অজিত বল্‌ল—প্রতিভা ভুল হয়েছে, কিন্তু তবু জিজ্ঞেস করি তাহলে আমাকে বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছিলে কেন তুমি ?

প্রতিভা চোখটা একটু মুছে নিয়ে বল্‌ল—হাঁ ঠিক্‌ বলেছ। তোমার কোনও দোষ নেই—ভুল সব আমারই। তোমার কোনও অপরাধ নেই—এ ত সবাই করে। আমার রাজী হওয়া ? কেন বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছিলাম ? তুমি আমাকে এতদিন ধরে চেয়ে এসেছ শুধু এই ভরসায়। একজনের কাছে যে রাজী হতেই হতো—ভাব্‌লাম তোমাকে জানি—সবার চেয়ে তুমি ভাল। সংসারের পথে তখনও, যাকে দেখে—এই সেই—বলে একেবারে চিনে ফেলা যায় সে লোকটার সঙ্গে দেখা হয় নি। অথচ আমার মত এমন জিনিষটাকে আমারই জন্য শুধু ফেলে রাখ্‌তে কেউ রাজী নন্‌। কাজেই সে বিপদে তোমারই কাছে রাজী হলাম।

অজিত এবার যুক্তির নেশায় বিভোর হয়ে উঠ্‌ল। একটু ঠাট্টা করেই বল্‌ল—বিবাহিতা স্ত্রীর মুখে একথা শুনে আজ আমার চাইতে আমার সমাজের লজ্জা বেশী হচ্ছে না কি ?

প্রতিভা উত্তর করল—শুনতে চেয়েছিলে তাই এ কটা কথা বলেছি। সমাজের লজ্জা? না ভুল করছ। আজ আমি শুধু একজনের বিবাহিতা স্ত্রী নই—আমি সন্তানের জননী—আমার আর সমাজকে লজ্জায় ফেলবার মত পথ কোথায়? আমার বিয়েতে রাজী হওয়ায়, আমার এই একটী কথায় যদি তাদের পৃথিবীতে আসা—আমি কেমন করে আর তা'হলে তাদের সমাজের এই জীর্ণ প্রাঙ্গণে ফেলে চলে যাই? আমার বুকের রক্ত তাই স্তন্য হয়ে এদের সুন্দর করে তুলছে।

অজিত চেঁচিয়ে বলে উঠল—তুমি কি বলতে চাও আমি তোমাকে কেবলই কষ্ট দিয়েছি?

প্রতিভা অজিতের [illegible]র দিকে মুখ তুলে বলল—তুমি কোনও দিন জেনে শুনে আমাকে কষ্ট দাও নি। তুমি ত এখনও আমাকে ভালবাস। আমি তোমার কাছে আছি—নিশিদিন আদর করে—আমাকে ভালবেসে সুখ পাও। আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার লাভ নেই ত কিছু।

অজিত বলল—তাহলে তুমি কি বোঝাতে চাও?—এ সন্তানদের প্রতি কি আমার মায়া নেই, স্নেহ নেই?

প্রতিভা এবার ধীর নেত্রদুটী অজিতের চোখের ওপর থেকে সরিয়ে নিল—বাইরের বিরাট আকাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগল—সব কথা কি বোঝান যায়? কথা শুনলেই কি বোঝা যায়? বোঝা পড়া মনের ভিতর—সেই প্রচণ্ড ঝড়ের

মুখে তোমার চিরপরিতৃপ্ত মনকে এগিয়ে এনেও লাভ নেই—কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না। এদের ভালবাস না? এই সন্তানরা যে তোমারই জয়ের উল্লাস—তারা যে তোমারই ছেলে মেয়ে বলে সংসারে তোমারই পরিচয় দেবে—এদের জন্য তোমার মায়া থাক্‌বে না, স্নেহ থাক্‌বে না? কিছু ভাবনি, কিছু চাও নি, অথচ এমন ধন পেয়ে গেছ—তুমি এদের ভালবাসবে না? এরা যে তোমার সব পাবার—আর আমার সব হারাবার জয়-মালা!

* * *

রাত তখন অনেক—এই মধ্যরাত্রে পৃথিবী যেন নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে—বাতাস একেবারে বন্ধ—ঝক্ ঝক্ শব্দ করে গাড়ীটা এত ছুটে চলেছে তবু একটু বাতাস নাই যে মুখের ওপরও লাগে—মাঠের ওপর কাল কাল গাছগুলো যেন স্থির চোখে গাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে চলে যাচ্ছে—

অজিত বা প্রতিভা আর কোন কথা বল্‌ল না—বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে কখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল।